ফেব্রুয়ারি ২০১৪
বর্ষ ২২ সংখ্যা ২৫৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বর্ষ ২২, সংখ্যা : ২৫৪, ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঈসায়ি
মাঘ-ফাল্গুন ১৪২০, রবিউল আউয়াল-রবিউস সানি ১৪৩৫ হিজরি

প্রতিষ্ঠাতা
হযরত মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর রহ.

সম্পাদক
মনযূর আহমাদ

সহ সম্পাদক
মুজিবুর রহমান হামিদী

অলঙ্করণ
মাওলানা হুমায়ুন আলহাবিব

সূ চি প ত্র

যোগাযোগ

জামেয়া নূরিয়া ইসলামিয়া (মাদরাসা-ই-নূরিয়া)
আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গিরচর, ঢাকা-১২১১
মোবাইল : ০১৮১৮ ০১৭১৩৭
e-mail : themonthlyrahmat@yahoo.com

মূল্য : ২০ টাকা

মাওলানা শাহ আহমাদুল্লাহ আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত ও আল আমীন প্রিন্টিং প্রেস, ৭২ নারিন্দা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত
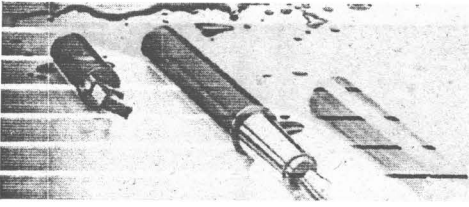
মুক্তমঞ্চ

১. নাস্তিক মানে কাপুরুষ

আগে একটা গল্প বলি। একবার এক মুসলিম পণ্ডিতের সাথে এক নাস্তিকের বির্তক হয়। বিতর্কে উভয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, আগামী এত তারিখে অমুক জায়গায় জনসমক্ষে উভয়ের যুক্তিগুলো তুলে ধরা হবে। এতে মানুষ যার যার ইচ্ছামত আস্তিক্যবাদ বা নাস্তিক্যবাদকে সমর্থন জানাবে। সময়মত উভয়ের বিতর্ক দেখতে মানুষ জড়ো হল। উপস্থিত হল নাস্তিক। আস্তিকের কোন খবর নেই। নির্ধারিত সময়ের অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল। মানুষ ধৈর্য্যহারা হয়ে ঘরে ফিরে যাবার উপক্রম হল। এ সময় হঠাৎ উপস্থিত হলেন মুসলিম পণ্ডিত। নাস্তিক তাকে দেখামাত্র ক্ষোভের সুরে এত দেরি হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করল। মুসলিম পণ্ডিত বললেন, একটু ধৈর্য্য ধরুন, বলছি। তো আমি আসার পথে যে বিশাল নদী রয়েছে, তার পাড়ে আজ কোন নৌকা ছিল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোন নৌকাা দেখা পেলাম না। অতঃপর হঠাৎ নদীর পাড়ের একটি বিশাল গাছ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এরপর তা ফেটে কিছু তক্তা বের হল। অতঃপর এ তক্তাগুলো একটা আরেকটার সাথে যুক্ত হয়ে একটি নৌকা তৈরি হল। আর সে নৌকায় করেই আমি নদী পার হয়ে এলাম। এ কারণেই এত দেরি হল।

নাস্তিক ওই কথা শুনে বলল, আপনি কি পাগল না আর কিছু? পণ্ডিত বললেন, কেন?

নাস্তিক বলল, কোন কারিকর ছাড়া এমনিতে একটি গাছ লুটিয়ে পড়ে তা থেকে তক্তা বের হয়ে নৌকা তৈরি হয় কিভাবে?

পণ্ডিত বললেন, তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে এত বিশাল পৃথিবী ও আকাশ কীভাবে কোন স্রষ্টা ছাড়া এমনিতে সৃষ্টি হতে পারে?

একথা বলার সাথে সাথে লোকজন 'নাস্তিক্যবাদ নিপাত যাক' বলে শ্লোগান দিতে আরম্ভ করল এবং গণরোষের ভয়ে নাস্তিক বলল, আপনার কথাই ঠিক। নিশ্চয় এ পৃথিবীর একজন স্রষ্টা রয়েছেন। এরপর এ নাস্তিক সমাজে চোর ও কাপুরুষের জীবন যাপন করে মৃত্যুবরণ করে। এ একই অবস্থা আমাদের দেশের নাস্তিকদেরও।

এ দেশের মুসলমানদের উপর ক্রুসেডবাদী ইংরেজরা প্রায় দুইশত বছর পর্যন্ত তাদের স্বেচ্ছাচারি শাসন, শিক্ষা ও বিচার ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে সেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব থেকেই এ দেশের প্রায় ৯০% মুসলমানকে ইসলাম থেকে প্রায় বিচ্যুত করে ফেলে বটে, তবে মহান স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি তাদের মৌল বিশ্বাসে কোন চিড় ধরেনি। কিন্তু যখন থেকে এ অঞ্চলের মূর্তিপূজক সম্প্রদায়ের কিছু স্টুপিডের মাধ্যমে নাস্তিক মার্কস, এঙ্গলস ও লেনিনদের আবিস্কৃত 'লাল কাঁকড়া' এ দেশের ছাত্র সমাজে ছড়িয়ে পড়ে, তখন থেকে এ দেশের মুসলমানদের অনেকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হারাতে বসে। সে বৃটিশ-পাকিস্তান আমলের কমরেড মুজাফ্ফর থেকে শুরু করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নিয়ে এখন নাস্তিকের সংখ্যা এ দেশে লাখেরও বেশি হবে। বর্তমানে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার আশ্রয় নিয়ে নাস্তিকরা সুকৌশলে মানুষকে নাস্তিক ও ধর্মহীন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দু' একটি বাদে সকল দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক ম্যাগাজিনে প্রচুর নাস্তিক ছোট-বড় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। তারা এসব মিডিয়ায় ধর্মের প্রতি পুরোপুরি অনুগত লোকদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল, ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী ও জঙ্গীবাদী ইত্যাদি বলে প্রতিনিয়ত গালাগালি করে। আবার মাঝে-মধ্যে মানুষকে 'ধর্মের বাণী' শুনিয়ে তারা ধর্মবিরোধী নয় বলে প্রমাণ করার চেষ্টাও করে। মূলত ধর্মের প্রতি আস্তিকদের আনুগত্য দুর্বল হবার কারণেই এসব কাপুরুষ নাস্তিক চোরের চরিত্রে তাদের এসব শয়তানী চরিতার্থ করতে সমর্থ হচ্ছে। এসব মিডিয়ার মালিকদের অনেকে আস্তিক ও ধর্মপরায়ণ হলেও ব্যবসার স্বার্থে তারা নাস্তিকদের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পন করছে। অনেকে নাস্তিকদের পরিচালিত এসব মিডিয়ায় মাঝে-মধ্যে 'ধর্মের বাণী' দেখতে পেয়ে খুব খুশী হয়। হ্যাঁ! এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সারাক্ষণ নাস্তিক্যবাদ চর্চাকারী এ নাস্তিকরা 'ধর্মের বাণী' ছাপে শুধুমাত্র তাদের ভাষায় নির্বোধ ও পশ্চাদপদ তথা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ আস্তিকদেরকে তাদের ব্যবসা ও প্রচারের আওতাভুক্ত রাখার জন্য, যেমন ধর্মের প্রতি দুর্বল আনুগত্যের রাজনীতিক দলগুলো মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য মাঝে-মধ্যে ধর্মের কথা বলে। তবে এটা শতভাগ সত্য যে, এক-দুইজন বাদে এ নাস্তিকেরা সবাই কাপুরুষ ও চোর চরিত্রের। কারণ, তারা যদি নিজেদেরকে সরাসরি নাস্তিক বলে পরিচয় দিত, তাহলে তাদেরকে স্পষ্ট চিনতে পারত। এসব স্টুপিডের প্রতি স্বভাবতই আমার মনে একটি প্রশ্ন জাগে, তোমরা কাপুরুষের মত আস্তিকদের প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করে ও চোরের মত আস্তিক সমাজে পরিচয় গোপন করে আর কতদিন আত্মগোপন করে থাকতে পারবে? তোমরা কাপুরুষ ও চোর চরিত্রের, নাহলে প্রয়াত ড. আহমদ শরীফ ও মুরতাদ তাসলিমা নাসরিনের মত নিজেদেরকে নাস্তিক ও কোরআন বিরোধী বলে ঘোষণা দিচ্ছ না কেন এবং তোমরা নাস্তিকরা সবাই মিলে 'নাস্তিক সম্প্রদায়' হিসেবে আলাদা পরিচিতি গ্রহণ করছ না কেন? তাছাড়া তোমরা মরলে তোমাদের ভাষায় প্রতিক্রিয়াশীল, ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী মোল্লাদের দিয়ে *সাম্প্রদায়িক* পদ্ধতিতেই মাটির নীচে চাপা পড়তে তোমাদের কোন লজ্জা হয় না কেন? এ ছাড়াও তোমরা বিয়ের জন্য নাস্তিক্যবাদী পদ্ধতি আবিষ্কার না করে ধর্মীয় *সাম্প্রদায়িক* রীতিতে বিয়ে করছ কেন?

আমি বুদ্ধিজীবি ও সাংবাদিক নামধারী এসব স্টুপিড, কাপরুষ ও চোর চরিত্রের নাস্তিকদের জানিয়ে দিতে চাই, তোমাদের মুখোশ উন্মোচনের কাজ আমরা ইতোমধ্যে শুরু করেছি। শীঘ্রই তোমাদের নাম-পরিচয় ও কুকর্ম (ধর্মবিরোধী তৎপরতা) উল্লেখ করে নাস্তিক্যবাদের শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হবে। অতএব, তোমরা হয়তো তাড়াতাড়ি মুসলমান হয়ে যাও নতুবা আল্লাহর এ জমিন ছেড়ে নাস্তিকতার জগতে চলে যাও। পারবে আল্লাহর পৃথিবী ছেড়ে পালিয়ে যেতে?

২. ইমাম মাহদি এলে কাদিয়ানিরা কি করবেন?

আহমাদিয়া মুসলিম জামাআত ওরফে কাদিয়ানী নামের সম্প্রদায়টি মুসলিম বিশ্বে আলোচিত একটি গোষ্ঠী। আলিমদের দাবির মুখে আরব বিশ্ব ও আফগানিস্তান-পাকিস্তানসহ প্রায় সকল মুসলিম দেশে এ সম্প্রদায়টিকে সাংবিধানিকভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের দেশের হুজুরগণ তাদেরকে সাংবিধানিকভাবে অমুসলিম ঘোষণা করার দাবীতে ৩০ বছর ধরে আন্দোলন করে আসছেন। বাইতুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মরহুম মাওলান উবাইদুল হকের

আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত সহ অনেক সংগঠন কাদিয়ানিদেরকে সরকারী ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করার দাবিতে অনেক সভা-সমাবেশ করেছে। ২৮ মে ২০১০ শুক্রবারে পাকিস্তানের লাহোর শহরে কাদিয়ানিদের দুইটি মসজিদে দুর্বিত্তদের আত্মঘাতী বোমা হামলায় ৮০ জন লোক নিহত ও ১০৮ জন আহত হয়েছে।

কাদিয়ানি বিরোধীদের দাবি

কাদিয়ানী বিরোধী লেখকদের বইতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'বর্তমান ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান উপজেলার জনৈক তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের ভক্ত চাকুরে ছিল। ওই সময় ভারত উপমহাদেশের মুসলিম-হিন্দু উভয় সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির জন্য সশস্ত্র ও নিরস্ত্র উভয় প্রকারের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। মুসলিম সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির জন্য জিহাদ ফরজ বলে প্রচার করছিল। কিন্তু এতে বাধ সাধে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের ভক্ত চাকুরের ছেলে গোলাম আহমদ। সে চাচ্ছিল, ব্রিটিশ শাসন বিরোধী জিহাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে হিরো হতে। প্রথমে সে প্রচার করে, 'ব্রিটিশ সরকারের মত একটি ন্যায়পরায়ণ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা কখনো ঠিক হতে পারে না। এতে আশানুরুপ সাড়া পাওয়া না গেলে সে দাবি করে, আমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী এসেছে যে, কুরআন ও হাদিছে জিহাদের যে বিধান রয়েছে, তা আল্লাহ এখন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য রহিত করে দিয়েছেন।' এতে মানুষ তাকে প্রশ্ন করে, 'ওহী তো আসে কেবল নবী-রসুলগণের কাছে। আপনিতো নবী নন, আপনার কাছে ওহী এল কিভাবে?' সে বলল, 'আমি প্রকৃত নবি নই বটে, তবে আমি ছায়া নবি। মূল নবির আগমন ধারা আল্লাহ কর্তৃক বন্ধ হলেও ছায়া নবির আগমনের ধারা বন্ধ হয়নি।' গোলাম আহমদের এ কথা জনসমাজে প্রচারিত হলে আলিমগণ তাকে মিথুক বলে এবং তার কথায় কান না দেবার জন্য আহবান করে। পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় তার জিহাদ-বিরোধী প্রচারণা ও অনুসারী বৃদ্ধি পেলে আলিমরা তাকে ও তার অনুসারীদের কাফির (ভূয়া/অমুসলিম) বলে ফতওয়া দেয় এবং তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে। বিরোধীদের আন্দোলন ও প্রচারণার মোকাবেলায় হিমশিম খাওয়া গোলাম আহমদ এক পর্যায়ে নিজেকে 'ছায়া নবি' দাবী করার পরিবর্তে ইমাম মাহদি বলে দাবি করে এবং ঘোষণা দেয়, 'আমি হযরত মুহাম্মদ সা.-এর প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদি। বিশ্বের সকল মুসলমানকে আমার কাছে বাইয়াত হতে হবে। যে আমার কাছে বাইয়াত হবে না, সে ইসলাম থেকে খারিজ (অমুসলিম) হয়ে যাবে।' এ দাবির প্রেক্ষিতে আলিমগণ তাকে বলল, তুমি ইমাম মাহদী হলে হযরত ঈসা আ. কোথায়? হযরত মুহাম্মদ সা. তো ইমাম মাহদীর আগমনের সাথে হযরত ঈসা আ. এর আগমনের কথাও বলেছেন। তখন গোলাম আহমদ বলল, 'ইমাম মাহদী ও হযরত ঈসা আ. একই ব্যক্তির দুইটি উপাধি। যিনি ইমাম মাহদী, তিনি হযরত ঈসাও আ.।' এক্ষেত্রে গোলাম আহমদ আশ্রয় নেয় সুনান ইবনু মাজা শরীফে হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীছের (৪০৩৯) অপব্যাখ্যার। হাদীছটি এই, 'ইসলামের অবস্থা দিন দিন কঠোর হতে থাকবে, দুনিয়ার অবস্থা দিন দিন কঠিন হতে থাকবে, মানুষের মাঝে দিন দিন সঙ্কীর্ণতা বৃদ্ধি পাবে। আর মাহদী এলে তাঁর পর পর ঈসা বিন মারয়াম আসবেন।' এ হাদীছটিতে ولا مهدى إلا বাক্যের পর عيسى শব্দটি উহ্য রয়েছে। কিন্তু গোলাম আহমদ উহ্য শব্দটি না মেনে হাদীছটির অর্থ করেছে, 'হযরত ঈসা বিন মারয়াম আ. ছাড়া আর কেউ ইমাম মাহদী নন।'

কাদিয়ানী বিরোধী লেখকরা আরো লিখেছেন, 'গোলাম আহমদ তার মেধা ও যোগ্যতাকে ইসলাম প্রচারের পরিবর্তে দুনিয়াতে মানুষের সস্তা বাহবা লাভের পথে ব্যয় করেছে। এজন্য সে একেক সময় একেক দাবী করেছে এবং ব্রিটিশ সরকার তাকে সর্বাত্মক সহায়তা করেছে। আর এজন্য দেখা গেছে, বিশ্ব কাদিয়ানীদের প্রধান কার্যালয় স্থাপনের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে লন্ডনে।'

কাদিয়ানীদের ইমাম মাহদীর বইতে যা রয়েছে

কাদিয়ানী বিরোধী লেখকদের অভিযোগের সত্যতা যাচাই করার জন্য একসময় গিয়েছিলাম আহমাদিয়া মুসলিম জামআতের চট্টগ্রাম কার্যালয়ে। তারা আমাকে তাদের কিছু প্রকাশনা হাতে তুলে দিল। তন্মধ্যে একটি ছিল তাদের গুরু গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর লেখা। স্ববিরোধী বক্তব্য ও কোরআন শরীফের আয়াত ও হাদীছ শরীফের অপব্যাখ্যায় ভরা 'হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আহবান' নামের এ পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠার শুরুতে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের স্তুতি গেয়ে বলেছেন, 'আমি আল্লাহ তাআলার শোকর করিতেছি যে, আমাদিগকে এরুপ ন্যায়বান ও শান্তিপূর্ণ গভর্মেন্ট দিয়াছেন যাহার তুলনা পৃথবীর আর কোন গভর্মেন্টের সহিত তুলনা হইতে পারে না। হযরত ঈসা আ.-এর সময় রোমীয় গভর্মেন্ট ন্যায়পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু আমাদের গভর্মেন্ট রোমীয় গভর্মেন্ট হইতে বহুগুণে বেশী ন্যায়বান।'

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর উপরোক্ত বক্তব্য তার ব্যাপারে তার বিরোধীদের অভিযোগের সত্যতাই প্রমাণ করে। কারণ, তিনি যদি সত্যি ইসলামের সেবক হতেন, তাহলে তিনি অবশ্য এভাবে খ্রিষ্টান ব্রিটিশ সরকারের প্রশংসা করতেন না। বরং তিনি খ্রিষ্টান ব্রিটিশ সরকারের শাসন-শোষণ প্রতিরোধ করে তার স্থলে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতেন, যেমন করেছেন ভারতবর্ষের অন্যান্য আলিমগণ। তো এহেন গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারীদের প্রতি আমার আহবান, আপনারা গোলাম আহমদকে একজন পথভ্রষ্ট মৌলভী বলে স্বীকার করে প্রকৃত ইমাম মাহদী ও হযরত ঈসা আ.-এর আগমনের অপেক্ষা করুন। নতুবা তাঁরা উভয়ে আগমন করলে আপনারা কি করবেন তা আগে থেকে ঠিক করে রাখুন। সময় থাকতে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত। আল্লাহ প্রত্যেক সত্যানুসন্ধানী মুসলিমের জন্য সত্যকে উপলব্ধি করার পথ সহজ করে দিন।

আবুল হুসাইন আলে গাজী
ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষক ও গবেষক

আরেকটি সূর্যোদয়ের অপেক্ষা

অনিশ্চয়তার পথে দেশ। গোমট পরিস্থিতিটা দিন দিন গভীর হচ্ছে। জনগণের শান্তি-স্বস্তির কথা এখন বাতুলতা মাত্র। একে তামাশাও বলা যেতে পারে। এখানে নির্বাচন মানে খেলা এবং এই খেলা অনুষ্ঠানের এক মাত্র উদ্দেশ্য ক্ষমতা চর্চা করা। ক্ষমতা-গর্বিদের দেশ ও দশের অগ্রসর উন্নতি কেবলই ছলনা। প্রতিবাদি মানুষের অপরিমেয় রক্ত ও অজস্র লাশের উপর দাঁড়িয়ে কোন স্বভাবিক-সুস্থ ব্যক্তি-গোষ্ঠীর পক্ষে এমন উল্লম্ফন ও স্পর্ধা প্রদর্শন সম্ভব নয় এবং তা কোন সুন্দর ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহও নয়। তবে কি সঙ্কটের অতলে হারিয়ে যাচ্ছে দেশ ও ভবিষ্যৎ? এমন জিজ্ঞাসা ও আশঙ্কা প্রকটতর হয়ে উঠছে প্রতিক্ষণ। কোথাও কোন সুসংবাদ নেই। হতাশ ও আশাহত সবাই।

সরকার মনে করছে, তারা শতভাগ সফল। বিরোধীদলকে বাইরে রেখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাফল্যই তাদের সক্ষমতার স্বাক্ষর। যে কারো অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করার দুঃসাহসও তারাই সংরক্ষণ করে। তবে বিরোধীজোটের নির্বাচন বর্জনের সাফল্যটাও বোধ হয় সরকারের মাথায় আছে। তাদের বিরক্তিকর বাগাড়ম্বর তো তাই প্রমাণ করে।

আসলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কখনোই গণতান্ত্রিক গুণাবলী প্রতিপালিত হয়নি। সবগুলো নির্বাচনে সন্দেহ শব্দটি আবশ্যিকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। উপরন্তু এই নির্বাচন ও নির্বাচন পূর্ব সহিংসতা দেশটিকে বিপর্যয়ের কিনারে ঠেলে দিয়েছে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা অর্থনীতিকে হুমকিগ্রস্ত করেছে। যথেষ্ট কম মজুরি এবং কারখানাগুলোর নিরাপত্তাহীনতা ইতিমধ্যেই বিরাট সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। সহিংসতা হ্রাস কিংবা স্থিতিশীলতায় প্রত্যাবর্তনের কোন লক্ষণ এখনও নেই। এ বছর অর্থনীতির সূচক সর্পিল বাঁক নিয়ে নিম্নমুখি হওয়ার প্রবণতা প্রবল। আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থান কিংবা সর্বাত্মক গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও করছেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

আর এর মূলে রয়েছে দু'টি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী বলয়ের ক্ষমতার খাহেশ। জাতি এখন সব সমস্যার মূলে দু' বেগমকে চিহ্নিত করেছে। খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা বিগত ২০ বছর দেশটাকে শাসন করছেন। এঁরা দেশটাকে অনিশ্চয়তার প্রান্তসীমায় ঠেলে দিয়েছেন। এঁরা জাতিকে শুধু দুর্নীতি ও দুরাশা-হতাশা উপহার দিতে পেরেছেন।

এদের অতীত বিবেচনায় নিলে অবলিলায় বলা যায়, এটা সম্ভব নয়, তারা কখনই একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছাবেন। গত কয়েক মাসে সমঝোতার পথ বেছে নিতে তারা বহু ধরনের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু সেসবকে তাঁরা অগ্রাহ্য করেছেন একপ্রকার শপথের সাথে। বিপরীতে তারা কাঁদা ছোড়াছুড়ির খেলা বেছে নিয়েছেন। নির্বাচনের আগে তারা তাদের আপন অবস্থান থেকে এক ইঞ্চি নড়েননি। তারা ইচ্ছা করলে সহিংসতা খুবলে খাওয়া দেশটাকে বাঁচতে সাহায্য করতে পারতেন। তাদের কার্যক্রম প্রমাণ করেছে, দেশে সুশাসন নিশ্চিত করা কিংবা সহিংসতা বন্ধ করার চেয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করাটাই সাফল্যের রাজতোরণ।

নির্বাচনের পর শেখ হাসিনা বিরোধী জোটকে অস্থিতিশীলতার পথ থেকে সরে না আসা পর্যন্ত কোন ধরণের আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। বর্তমান সরকার অস্থিতিশীল বলতে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে নিয়ে সরাসরি সন্ত্রাসী হামলাকেও বুঝিয়ে থাকেন। খুবই অসম্ভব, নিকট ভবিষ্যতে শেখ হাসিনা বিরোধী জোটের সাথে কোন আলোচনায় বসবেন। এর কারণ, তিনি যা চেয়েছিলেন তা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছেন। আর সেটা হলো ক্ষমতায় আরেক মেয়াদ থাকতে ভারতের অব্যাহত সমর্থন এবং বাকি বিশ্বের কাছ থেকে মৃদু ভৎসনা ও ক্ষীণ নিন্দামন্দ।

তা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের অধীনে এক দলান্ধ শাসন খুব শিগগিরই অস্থিতিশীলতায় ডুব দিবে। স্থিতিশীল একদলীয় শাসন শুরু করাই তাদের পক্ষে অসম্ভব হবে, যতক্ষণ না বিরোধী শক্তিকে যথেষ্ট মাত্রায় দমন করতে সক্ষম না হবে– যতক্ষণ না তারা আর সরকারের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত না হবে। তবে বিএনপিসহ বিরোধীজোট এখনই ভেঙে পড়বে এমন আশা করাকে দুরাশা বলা যেতে পারে। উপরন্ত শেখ হাসিনার যে জনপ্রিয়তা ও সুশীলদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল তা ধূলিসাৎ হতে শুরু করেছে। গত নির্বাচনে ভোটারদের নিম্ন উপস্থিতি তারই ইঙ্গিত বহন করে। ১০ থেকে ২০ ভাগ ভোটদান কেবল এই অর্থ বহন করে না যে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ শেখ হাসিনার বিরোধিতা করে। এটাও ইঙ্গিত দেয়, তার জনপ্রিয়তার মেরুদণ্ডটা ভেঙ্গে পড়েছে। একটি স্বৈরশাসনের ভিত্তি হচ্ছে ব্যাপক হারে উদাসীন জনগোষ্ঠী এবং একটি যুদ্ধংদেহী বিরোধী শক্তি। এ ধরনের সরকারের জন্য অব্যাহত সামরিক ও পুলিশি সহায়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। শেখ হাসিনার জন্য এরা কতটা পরীক্ষিত তা বারবরই প্রশ্নবোধক ও গভীর পর্যবেক্ষণের বিষয়।

তবে কি আরেকবার সামরিক যন্ত্রণার কবলে পড়তে যাচ্ছে দেশটা! আমাদের কামনা, এমন উড়ন্ত খবর কখনই বাস্তবতা না পাক। সকলের অংশগ্রহণে আরেকটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়ে যাক। এটাও স্পষ্ট, এই সরকার যত দম্ভ দেখাক তার ভেতরটা ফাঁকা। এর প্রধান কারণ, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যর্থতা।

সামরিক অভ্যুত্থান রাজনৈতিক উত্তেজনা সাময়িক অবদমিত করবে বটে কিন্তু সেটা এর আদৌ সমাধান নয়। খালেদা-হাসিনার দ্বন্দের চেয়েও এখন এদেশে মতাদর্শগত বিরোধ প্রকট ও গভীর। শাহবাগ ও শাপলা চত্তর উত্থান যার স্পষ্ট প্রমাণ। কারণ বিএনপি বাংলাদেশকে একটি মুসলিম জাতি হিসেবে ব্যাখ্যা করে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতিসত্ত্বার ভিত্তিতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র আকাঙক্ষা করে। সুতরাং কোন সামরিক শক্তির পক্ষে এই মতাদর্শগত সঙ্কটের সমাধান দেয়া সম্ভব নয়। এমন ঘটলেও মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে আবারও দেশ রাজনৈতিক অস্থিরতার আগুনে নিক্ষেপিত হবে।

আর যদি গৃহ যুদ্ধের অন্ধকারে আপতিত হয় তবে তা শুরুই হবে অপরিমেয় খুন ও অযস্র জীবনের বিনিময়ে। আমার দেশটা এরা যে দিকেই ঢেলে দিক, এসবের যে কোনটির লক্ষে যাত্রা শুরু করুক, ২০১৪ সালটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত মন্দরূপে প্রতিভাত হবে সে লক্ষণ এখন দিবালোকের মত স্পষ্ট। তবুও আমরা আরেকটি সুখী ও সম্ভাবনাময় আলোকিত সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করব। জয় হোক বাংলাদেশের, জয় হোক ষোল কোটি মানুষের। পরাজয় হোক সকল অসুন্দর ও অশুভতার। বিতাড়িত শয়তানের কুদর্শন, কুকর্ম ও কুমন্ত্রণা থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাই।
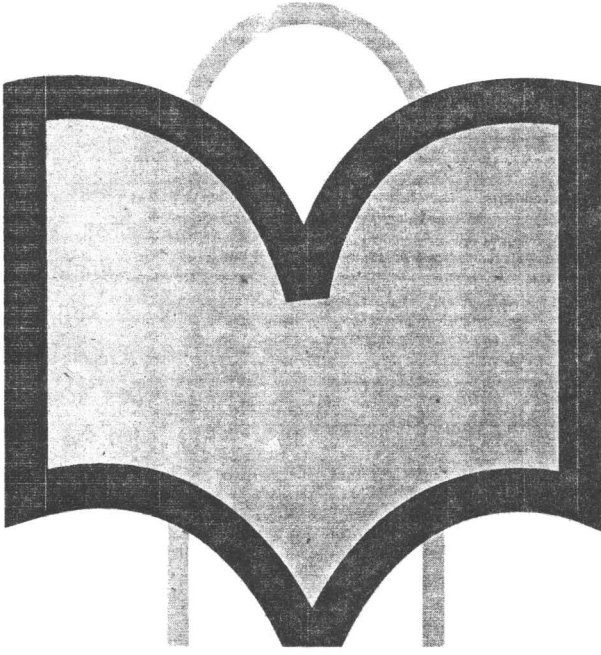
ফাতহুল জাওয়াদ

মাওলানা মাসঊদ আযহার

(গত সংখ্যার পর)

সূরা আলে ইমরান, মাদানী -১৪০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.

-যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে অনুরূপ আঘাত তো তাদেরও লেগে ছিলো। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলো পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই। যাতে আল্লাহ মু'মিনদেরকে জানতে পারেন এবং তাদের মধ্য থেকে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন। আল্লাহ জালিমদেরকে পছন্দ করেন না।

সার সংক্ষেপ গোজওয়া ওহুদে মুসলিমদের উপর যে ঝঞ্ঝা আপতিত হয়েছিল তাতে আল্লাহ তা'আলার কয়েকটি হেকমত নিহিত ছিল।

প্রথমটি হচেছ আল্লাহ তা'আলা বিজয়ী ও পরাজিত হওয়ার বিষয়টা লোকদের মাঝে পরিবর্তনশীল করে রেখেছেন। বিগত বছর মুশরিকরা বদরে পরাজিত হয়েছিল, এ বছর তোমরা পরাজয় আস্বাদন করলে।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে : যেহেতু বিপদ-সংকটের সময় মুমিন ও মুনাফিকের পরীক্ষা হয়ে যায়, সেহেতু আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে চিহ্নিত করে দেন কে মুনাফিক এবং কে মুমিন।

তৃতীয় হচ্ছে : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অনেককে শাহাদাতের সুউচ্চ মর্যাদা ও সম্মান নসীব করেছেন। (অবশিষ্ট দু'টি পরবর্তী আয়াতে আলোচিত হবে।) আর আল্লাহ তা'আলা কুফ্র ও শিরকে লিপ্ত জালিমদের আদৌ ভালোবাসেন না। (তাই তারা যেন এই আত্মতৃপ্তির শিকার না হয় যে, আল্লাহ ভালবাসেন বলে তারা বিজয় অর্জন করেছে।

বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থের উদৃতি : ১. *আল্লাহ তা'আলা জয়-পরাজয়কে বিবর্তনশীল করেছেন।* এর অর্থ এই নয় যে, তিনি যুদ্ধের সময় কখনও মুসলিমদের সাহায্য করেন, কখনও কাফিরদের সাহায্য করেন। বিষয়টা আদৌ এমন নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার সাহয্য লাভ অত্যন্ত সম্মান ও একান্ত সৌভাগ্যের বিষয়, যা কখনো কাফিররা প্রাপ্ত হয় না।

واعلم انه ليس المراد من هذه المداولة ان الله تعالى تارة ينصر المؤمنين واخرى الكافرين وذلك لان نصرة الله منصب شريف واعزاز عظيم فلا يليق بالكفار. (التفسير الكبير)

-বরং আয়াতের মর্ম হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা কখনও কখনও কাফিরদের উপর কাঠিন্য আপতিত করেন এবং কখনও মুমিনদের উপর কাঠিন্য অরোপ করে তাদের পরীক্ষা করেন। যদি সর্বক্ষেত্রে মুসলিমরা বিজয় অর্জন করত তবে মুক্ত পন্থায় ঈমান গ্রহণের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়ে যেত। মানুষ শুধু বিজয়ের জোয়ার দেখে ঈমান গ্রহণ করে নিত। (তাফসীর কাবির, বয়ানুল কুরআন)

২. মুসলিমরা যুদ্ধে অপূরনীয় ক্ষতিগ্রস্ততার শিকার হয়েছিল। তারা মর্ম বেদনায় কাতর ছিল। উপরন্তু মুনাফিক ও শত্রুদের উপহাস-বিদ্রুপ তাদেরকে আরো যন্ত্রণা-দগ্ধ করে তুলে ছিল। তারা বলছিল, মুহাম্মদ সা. যদি সত্যই নবী হতেন তবে তিনি কেন এত বড় ক্ষতিগ্রস্ততার শিকার হলেন? ক্ষণিকের জন্যও কেন তিনি পরাজিত হবেন?

ফলে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে শান্ত না দিয়ে বলেন, যদিও তোমরা এই লড়াইয়ে হতাহত হয়েছ, সীমহীন সঙ্কট ও যন্ত্রণার শিকার হয়েছ, কিন্তু তোমাদের প্রতিপক্ষও তো তোমাদের মত ঝঞ্ঝার কবলে ছটফট করেছিল! ওহুদে তোমাদের পঁচাত্তরজন শহীদ হয়েছে, বহু আহত হয়েছে। এর বিপরীতে এক বছর আগে বদরে ওদের সত্তরজন নিহত হয়ে জাহান্নমবাসী হয়েছিল। তারা অনেকে আহতও হয়েছিল। আর এই যুদ্ধেও তো তাদের অনেক লোক আহত-নিহত হয়েছে!

ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسنوهم باذنه

-একথা প্রমাণ করে, বদরে তাদের সত্তরজন অপমানজনক বন্দি হয়েছিল, তোমাদের একজনেরও তো এমন অপমান সহ্য করতে হয়নি! তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ততার সাথে তাদের ক্ষতিগ্রস্ততার পরিমাপ কর, তবেই তোমাদের যন্ত্রণা লাঘব হবে, তোমরা বাস্তবতা

উপলব্ধি করতে পারবে। তাদেরও আর কখনও অহঙ্কার ও রীরত্ব ফলিয়ে মাথা উঁচু করে কথা বলার সুযোগ থাকল না। প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সুসময়-দুঃসময়, বিজয়-পরাজয় ক্রমিক ধারায় আবর্তিত হয়। এক আসনে স্থির থাকে না। এই নিয়মের ভিতর প্রভূত শিক্ষা ও প্রজ্ঞা লুকিয়ে আছে। তাই যখন তারা (মুশরিকরা) বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বাতিলের সাহায্য-সহযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, তোমরা কীভাবে সত্যের পক্ষে সক্ত পায়ে দাঁড়াতে হীনবলতার শিকার হতে পার!

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যাতে আল্লাহ মু'মিনদেরকে জানতে পারেন অর্থাৎ, সাচ্চা ঈমানদারদেরকে মুনাফিকদের থেকে পৃথক করে ফেল। উভয় পক্ষের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোন রূপ সাযুজ্য পরিলক্ষিত নয়।

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ -আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না।

الظّٰلِمِيْنَ এর দ্বারা যদি মুশরিকদের বুঝান হয়, যারা ওহুদে মুসলিমদের প্রতিপক্ষ ছিল, তবে এর মর্মার্থ হবে, তাদের প্রত্যক্ষ বিজয়ের কারণ এই নয়, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালবাসেন বা পছন্দ করেন। বরং এর কারণ অন্য। আর যদি الظّٰلِمِيْنَএর দ্বারা সেই মুনাফিকদের বুঝান হয়, যারা ঠিক যুদ্ধের মুহূর্তে মুসলিমদের থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে ছিল– যে মুনাফিকরা আল্লাহর নিকট বিদ্রোহী রূপে পরিগণিত হয়েছিল। এ কারণেই তারা ঈমান ও শাহাদাত বরণের সৌভাগ্য থেকে দূরে নিক্ষেপিত হয়েছে। (তাফসীরে ওসমানী)

৩. 'যদি তোমরা পরাজয়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ততার শিকার হয়ে থাক তবে এর আগে বদরে কাফিররা চরম পরাজয়ের শিকার হয়েছিল। কখনও উপকরণের অভাবে, কখনও হীনবলতার কারণে পরাজয় ঘটতেই পারে। অবশ্য এই ধরণের পরাজয়ের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে আসল-নকল নিরুপন করা যায়। তবে কখনও কখনও কোন শক্তিকে আল্লাহ তা'আলা একান্ত ইচ্ছায় পরাজিত করেন ও কতককে শাহাদত বরণের সৌভাগ্য দান করেন। যাতে এদের রক্তে আগুন ধরে। যাতে ঘুমন্তরা আহত হয়ে সিংহের মত গর্জে উঠে। (টীকা লাহোরী রাহ.)

আশার কথা : 'বিজয় ও পরাজয় পালাবদলের বিষয়। আল্লাহ তা'আলার একান্ত অভিপ্রায় হচ্ছে এর মাধ্যমে মুমিন-মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা এবং মুসলিমদেরকে সংশোধিত করা। এই মহান লক্ষ্যে এই পরাজয়ের ঘটান হয়েছিল। কাফিররা বিজয়ী হয়েছিল আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন বলে একথা আদৌ সত্য ও সঠিক নয়। (মাওজাহুল কুরআন)

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ والله لا يحب من لا يكون ثابتا على الايمان صابرا على الجهاد - যে ব্যক্তি ঈমানে ও জিহাদে দৃঢ়পদ নয় আল্লাহ তাকে অপছন্দ করেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ : তাফসীর কাবির ও তাফসীর কুরতুবীর গ্রন্থাকার এই আয়াতের তাফসীরে শাহাদাতের মহিমা ও শহীদ নামকরনের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠকগণ তা পড়লে উপকৃত হবেন।

বিশেষ কথা : 'তোমাদের মধ্য থেকে কতককে শাহাদাতের মর্যাদায় অভিসিক্ত করা ছিল আল্লাহ তা'আলার একান্ত ইচ্ছা। ক্ষেত-খামারের সজীবতার জন্য যেমন সূর্যের আলো ও পানির একান্ত প্রয়োজন হয়, নতুবা তা নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি শহীদদের ত্যাগের মহিমার উপর গড়ে উঠে একটি জাতির প্রতিষ্ঠা ও সম্মানজনক জীবন। এই শহীদদদের সিঞ্চিত লক্ত-ধারাই সৃষ্টি করে আদর্শ মানুষ ও উর্বর মানসিকতা। স্বাধীনতা ও মাথা উঁচু রাষ্ট্র গঠনের রাজ পথ নির্মাণ করে শুধুই শহীদদের রক্ত-ধারা। যত দিন ত্যাগের চূড়ান্ত পরীক্ষা সম্পাদিত না হবে, শহীদের সংখ্যা অগনণ পর্যায়ে না দাঁড়াবে, ততদিন জাতি সতেজ, সফেদ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে সাফল্য পাবে না। যখন জাতির উন্নত-চরিত্রের লোকেরা ও সাদা মানুষের উলেখযোগ্য একটি অংশ অশঙ্কচিত্তে আপন আপন জীবন জাতি নির্মাণে নিবেদন করবে তখনই জাতির অবয়বে সজীবতা-সাফল্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। তারা মানবিকতার সৌরভে পৃথিবীকে আলোকিত করে তুলবে। যতদিনে তারা প্রতিপক্ষের প্রতিশোধ নিতে সক্ষম না হবে, ততদিন তারা অস্থির সময় কাটাবে।' (তাফসীরুল ফুরকান)

সূরা আলে ইমরান, মাদানী -১৪১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ

১৪১. আর উদ্দেশ্য (এও) ছিলো, যাতে আল্লাহ মু'মিনদের পরিশোধন করতে পারেন এবং কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।

সার সংক্ষেপ : বদর যুদ্ধে প্রকাশ্য পরাজয়ের চতুর্থ তাৎপর্য

যাতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে আবিলতা-পঙ্কিলতা থেকে পরিচ্ছন্নতা দান করেন (যারা পাপমুক্ত তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন)

পঞ্চম তাৎপর্য হচ্ছে : আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। (এটি দু'ভাবে সম্পাদিত হতে পারে।

এক. বিজয়ী হওয়ার ফলে তারা দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। তারা আরো উৎসাহের সাথে যুদ্ধ-ময়দানে অবতীর্ণ হবে। ফলে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

দুই. তারা মুসলিমদের উপর যুলুম করার কারণে আল্লাহর অভিশাপে নিপতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

(*সারাংশ*-বয়ানুল কুরআন)

অভিমত ও উদৃতি

১. وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -যাতে আল্লাহ তা'আল মু'মিনদের পরিশোধন করেন।

يكفر عنهم ذنوبهم ان كانت لهم ذنوب والا رفع لهم فى جاتهم بحسب ما اصيبوا به. (ابن كثير)

-যদি পাপ থাকে তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপ ক্ষমা করে দেন, নতুবা বিপদ অনুপাতে তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

২. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ -কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেন।

فانهم اذا ظفروا بغوا وبطروا فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم

কেননা, তারা বিজয়ী হওয়ার পর গর্ব ও অহঙ্কারে ফুলে উঠে। যা তাদের বিধ্বস্ত, ধ্বংস ও নিপাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (ইবনে কাছির)

৩. ওহুদের পরাজয়ের মাঝে আরো কিছু রহস্য লুকিয়ে আছে। এখানে সে সবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে:

এক. এর মাধ্যমে ঈমানদারদের পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল।

দুই. তোমাদের মধ্যে যাদের শাহাদাত লাভ ও পরকালীন অনন্ত সুখী জীবনের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল, তাদেরকে শাহাদাতে ধন্য করা উদ্দেশ্য ছিল।

তিন. যারা বিশুদ্ধ মুসলিম তারা যাতে এই যুদ্ধের ভয়াবহতায় দগ্ধ হয়ে নিখাদ হয়ে উঠে। যাতে কাফির-প্রতিপক্ষ বিধ্বস্ততার শিকার হয়। কেননা চিরন্তন সত্য কথা হচ্ছে, যেখানেই এমন লোকদের খুন প্রবাহিত হয় যেখানেই তা নতুন রং ধারণ করে। তখনই আল্লাহর অহম বোধ জ্বলে উঠে। ফলে কাফিরদের যারা পরিশুদ্ধির পথে এগিয়ে আসে তারা ঈমানদারদের জামাতে শরিক হয়ে যায়, অবশিষ্টদের উপর অদৃশ্য থেকে এমন আঘাত আসে যারা ফলে তাদের চিহ্নটুকুও পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যায়। (তাফসীর কাবির)

মর্মকথা : তোমরা বদরে যে সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং নিজেদের আমলকে আরো পরিশীলিত করে তুল। এমন যেন না হয়, তোমরা এই বিপর্যয়ের কারণে ভেঙ্গে পড়বে। এটি যুদ্ধের ময়দান। কখন এক পক্ষ বিজয়ী হয়, কখন অপর পক্ষ বিজয়ী হয়। বদরে তোমাদের আঘাতে তারা পরাস্ত হয়েছিল। ওহুদে তারা তোমাদের উপর হামলে পড়েছিল। কিন্তু একটি জাতির সুদীর্ঘ পথ চলার ইতিহাসে এক-দুটি ক্ষেত্রে অসফলতা ও অপ্রস্তুতি মূল্যায়নে কতটুকু গুরুত্ব রাখে। আসল বিবেচনার বিষয় হচ্ছে তোমাদের অন্তরের ঈমানী শক্তি। যদি তোমাদের অন্তরগুলো বিশ্বাসে বলিষ্ঠ হয়, ঈমানে প্রাণীত হয়, তবে সকল ক্ষেত্রে তোমরাই বজয় লাভ করবে, সারা পৃথিবীতে তোমারাই প্রতিষ্ঠার শীর্ষে অবস্থান করবে। আর এই পরাজয়টি দুর্ঘটা বশতঃ ঘটলেও এতে শিক্ষার উপকরণ রয়েছে এবং এতে কিছু উপকারিতাও লুকিয়ে আছে। প্রথমতঃ এর দ্বারা খাদ-নিখাদ যাচাই করা গেছে। যেসব মুনাফিক ও দোদুল্যমনা লোক মুসলিমদের মধ্যে ঘাপটি মেরে ছিল তাদের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। উপরন্তু যুদ্ধের ময়দানে কত রকমের সমস্যা ও সঙ্কট সৃষ্টি হতে পারে এবং কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে সে ব্যাপারে তারা স্পষ্ট ধারণা লাভ করেছিলেন। তাঁরা ভুলগুলো চিহ্নিত করে পরবর্তী সময়ে আরো সতর্কতা অবলম্বনে সক্ষম হয়েছিলেন। এই পরাজয় তাদের জন্য পথে দিশা প্রমাণিত হয়। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে তারা অবহেলায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে যে পর্যুদস্তুতার হয়েছিলেন তা তাদেরকে আরো সাহস ও শক্তি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করে। তারা ঈমানের পরীক্ষায় জিতে জান এবং তাদের ঈমান যে নিখাদ তাও প্রমাণিত হয়। (তরজুমানুল কুরআন)

সূরা আলে ইমরান, মাদানী -১৪২

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٤٢﴾

তোমরা কি মনে কর, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করাব, অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা দৃঢ়পদ?

সার সংক্ষেপ : আল্লাহ তা'আলা যে মহাসম্মান ও উচ্চতায় তোমাদেরকে পৌছাতে চান, তোমরা কি মনে করেছ, খুব সহজে সেখানে পৌছে যাবে এবং এজন্য তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখবেন না, কে কতটুকু আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং দৃঢ় পদ থাক? বিষয়টা এমন হবে তা ভাববে না। সম্মানের উচ্চতায় সেই পৌছতে পারে যে আল্লাহর পথে সকল কাঠিন্য ও যন্ত্রণা অকাতরে অম্লান বদনে বরদাস্ত করার সাহস রাখে। (তাফসীরে. ওসমানী থেকে সঞ্চিত)

বিভিন্ন তাফসীরের উদৃতি

والمعنى احسبتم يا من انهزم يوم احد ان تدخلو الجنة كما دخل الذين قتلوا وصبروا على الم الجراح والقتل من غير ان تسلكوا طريقهم وتصبروا صبرهم لا.

১. এই আয়াতের মর্ম কথা হচ্ছে, তোমরা যারা ওহুদের দিন পিছু হটেছিলে, তারা কি মনে করেছ, তোমরাও তাদের মত জান্নাতে প্রবেশ করবে যারা ওহুদে শাহাদাত বরণ করেছে? অথবা যারা আহত হয়ে যন্ত্রণায় কাতর হয়েছে? যতক্ষণ না তোমরা তাদের মত জীবন দিবে অথবা আঘাতের ব্যাথা আস্বাদন করবে? কখন এমন হবে না। (জিহাদ, যখম ও শাহাদাত ছাড়া কখনই এই মর্যদা লাভ করতে পারবে না?) -কুরতুবী

اى لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا ويرى الله منكم المجاهدين فى سبيله والصابرين على مقاومة الاعداء.

২. ততক্ষণ তোমাদের জান্নাতে প্রবেশের স্যেভাগ্য হবে না যতক্ষণ না পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। যতক্ষণ তিনি না দেখবেন, তোমাদের কে কে আল্লাহর পথে দৃঢ়তার সাথে শত্রুর মোকালোয় লড়াই করে। (ইবনে কাছির)

অনুবাদ : **আশেকে আহমাদুল উম্মী**

বক্তা ও ওয়ায়েজদের জন্য একান্ত অপরিহার্য গ্রন্থ

ইতিহাসখ্যাত বুযুর্গ লেখক উসমান ইবনে হাসান ইবনে আহমাদ শাকের আল খবাভী রহ. এর হৃদয় ছোঁয়া ওয়াজ ও বয়ানের অনবদ্য কিতাব

দূররাতুন নাছিহীন

অনুবাদ : মুফতী ইলিয়াস কাসেমী

বৈশিষ্ট্যাবলী

* প্রতিটি বয়ানের শুরুতে আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ বায়জাভী শরীফের আলোকে। * প্রতিটি বয়ানে ফজিলাত সংক্রান্ত অসংখ্য হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। * ঈমান উদ্দীপক অনেক দুর্লভ ও দুস্প্রাপ্য ঘটনার সমাহার রয়েছে। * বয়ানের শেষে ইমামগণের মতামতসহ মাসায়েল উল্লেখ করা হয়েছে।

মা-বোনদের জন্য সুসংবাদ!

প্রকাশিত হয়েছে উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ বুজুর্গ বিশিষ্ট মুহাদ্দিস বহুগ্রন্থ প্রণেতা শায়খুল হাদিস মাওলানা আশেক এলাহী বুলন্দশহরী রহ. কর্তৃক প্রণিত

তোহফায়ে খাওয়াতীন
নারী জাতীর শ্রেষ্ঠ উপহার

[মুসলিম নারীদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ-এর বাণী সংকলন]

মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ তকী উসমানী সাহেবের সৃষ্টিশীল কলমে কিছু আম্বিয়া আ., সাহাবায়ে কেরাম রা., ফোকাহ রহ., আইম্মা, মোহাদ্দেসীন, উলামা এবং ওলি আল্লাহদের সংক্ষিপ্ত এবং গঠনমূলক জীবনালোচনা

তাযকিরে
মহান ব্যাক্তিদের স্মৃতিচারণ

আমল ছে জিন্দেগী বন্‌তি হ্যায়

আমল ই জীবন

মাওলানা পীর জুলফিকার আহমদ নকশবন্দি

প্রকাশনায়

মক্কা পাবলিকেশন্স

ইসলামি টাওয়ার (দোকান-৩৬), বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
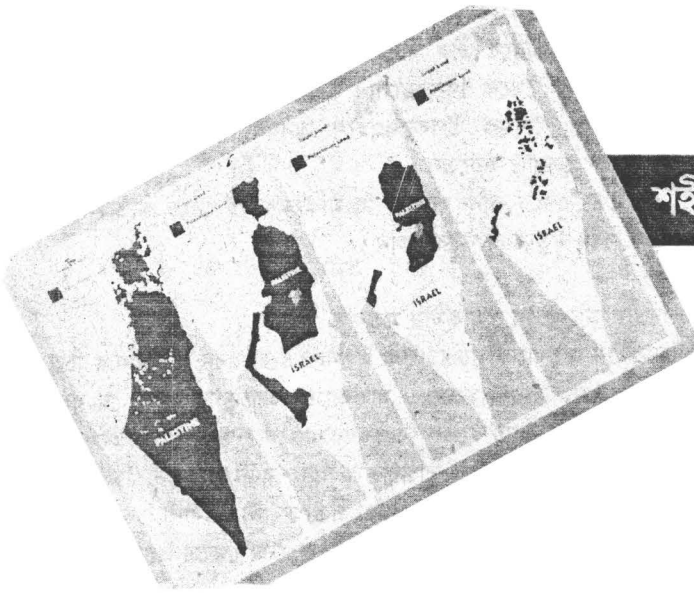
শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আয্যামের রচনাবলী থেকে

লাল কর্কট

অনুবাদ : আবদুস সাত্তার আইনী

[৩য় কিস্তি]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কার্ল মার্কস এবং মার্কসবাদ[১]

প্রথম আলোচনা **কার্ল মার্কস সম্পর্কিত কিছু কথা**

কার্ল হাইনরিখ মার্কস ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ই মে জার্মানির ট্রিয়ের-এ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৩ সালের ১৪ই মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মার্কসের বাবা জীবনের শুরুতে একজন ইহুদি ছিলেন, তাঁর নাম ছিলো হার্শেল মোর্দেখাই। এরপর তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং নাম পরিবর্তন করে ফেলেন। নিজের নতুন নাম রাখেন হাইনরিখ মার্কস। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে হার্শেলের ধর্মান্তর ছিলো মূলত একটি অর্থনীতিক কৌশল, যাতে তিনি খ্রিস্টীয় সমাজে তাঁর শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছেন, এ-কারণেই মার্ক ধর্ম সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন যে ধর্ম হলো মানুষকে প্রতারণা জালে ফেলে অর্থ উপার্জনের উপায় ও কূটকৌশল। এভাবে তিনি ইউরোপের চিন্তার জগতে নতুন চিন্ত াধারা সংযোজন করেছিলেন।

কাল মার্কস ইহুদি ধর্মগুরু মার্কস লেভি মোর্দেখাই (১৭৪৩-১৮০৪) এবং ইভা লৌ (১৭৫৩-১৮২৩)-এর নাতি। এ-জন্যে কতিপয় ইতিহাসবিদ এই মত ব্যক্ত করেছেন যে মার্কসবাদ মূলত ইতিহাসের ইহুদিবাদী বিশ্লেষণ এবং জীবন ও মানুষের তাওরাতীয় (বাইবেলীয়) ও তালমুদীয় দর্শন। [আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের সম্পর্কে বলেছেন, 'আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ, এমনকি মুশরিকদের চেয়েও অধিকতর লোভী দেখতে পাবেন।' (সুরা বাকারা আয়াত ৯৬) আল্লাহপাক তাদের সম্পর্কে আরো বলেছেন, 'আর তাদের নবী তাদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহপাক অবশ্যই তালুকতে তোমাদের রাজা বানিয়েছেন। তারা বললো, আমাদের ওপর তার রাজত্ব কীভাবে হবে, অথচ রাজত্বের ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশি এবং তাকে তো প্রচুর ধন-সম্পদ দেওয়া হয় নি।' (সুরা বাকারা : আয়াত ২৪৭)]

দ্বিতীয় প্রটোকলে[২] বলা হয়েছে, 'আমরা চার্লস ডারউইন[৩], কার্ল মার্কস ও নিটশের[৪] সফলতাকে তাদের মতবাদের প্রচলনের ভিত্তিতে বিন্যস্ত করেছি। তাঁদের জ্ঞান অ-ইহুদিবাদী চিন্তাধারায় যে-চরিত্রবিধ্বংসী প্রভাব সৃষ্টি করেছে তা আমাদের কাছে গুরুত্বের সঙ্গেই প্রতিভাত।'

কার্ল মার্কস তাঁর জীবনের শুরুতে অবিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন, মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্মানের উপযুক্ত পাত্র তিনিই, যিনি মানুষের কল্যাণে কাজ করেন। ধর্ম মানব-জীবনের মৌলিক ভিত্তি। ধর্মই আমাদের কল্যাণ ও প্রজ্ঞা শিখিয়ে থাকে।' [দেখুন *আশ-শুয়ুইয়্যাহ ওয়ালিদাতুল সাহয়ুনিয়্যাহ*, আহমদ আবদুল গফুর আল-আত্তার, পৃষ্ঠা ৫২; *আশ-শুয়ুইয়্যাহ ওয়াল ইনসানিয়্যাহ*, আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ]

কার্ল মার্কস দরিদ্রতার মধ্যে বেড়ে উঠেছেন এবং দরিদ্রতার মধ্যেই গোটা জীবন কাটিয়েছেন। মার্কসের স্ত্রী জেনি ভন ওয়েস্টফ্যালেন (Jenny von Westphalen) তাঁর দারিদ্র্যের বর্ণনা দেন এভাবে : তাঁদের কন্যারা যখন মারা যায়[৫], তাঁরা ওদের কাফনেরও ব্যবস্থা করতে পারেন নি। তাঁরা যে-বাড়িতে ভাড়াটে ছিলেন সে-বাড়ি থেকেও তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ, বাড়ি-ভাড়া পরিশোধ করার সামর্থ্য তাঁদের ছিলো না।[৬]

কার্ল মার্কস মতবাদ ও দর্শনের অধ্যয়নে এতোটাই প্রবৃত্ত ছিলেন যে তিনি কাজ ও পেশা ঘৃণা করতেন। এটাই তাঁর দরিদ্রতার গোপন কথা। এ-জন্যে তিনি প্রায় পুরোটা জীবন অন্যের পোষ্য হয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন; কারণ, তাঁর পেশা ছিলো না, অফিস ছিলো না এবং নিয়মতান্ত্রিক কোনো কাজ ছিলো না।

প্রথমে তিনি তাঁর দরিদ্র পিতার সম্পদের ওপর নির্ভরশীল থেকে জীবনধারণ করেছেন। এ-জন্যে একবার তাঁর পিতা তাঁকে চিঠিতে লিখেছিলেন 'তুমি একটা স্বার্থপর; তোমার যাবতীয় মানবিক গুণাবলির ওপর স্বার্থপরতা প্রাধান্য পেয়েছে।' যখন তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন, কার্ল মার্কস তাঁর মাকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের অংশ চেয়ে একটি চিঠি লেখেন; চিঠিতে তিনি শোক প্রকাশ করে একটি শব্দও লেখেন নি। তিনি পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত

সম্পদ শেষ করে তাঁর মা ও ভাইদের সম্পদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করতে শুরু করেন। তাঁর মাকে তাঁকে এক চিঠিতে লেখেন 'এটা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার যে তুমি চিরকাল ছোটো শিশু হিসেবেই জীবনযাপন করবে। এখন তোমার বয়স হয়েছে চব্বিশ বছর; সুতরাং তুমি নিজের ওপর নির্ভরশীল হও।'

কাজের প্রতি ঘৃণা কার্ল মার্কসকে সম্পদ উপার্জনের যে-কোনো উপায় এমনকি কূটকৌশল অবলম্বনে বাধ্য করেছিলো। তিন একজন প্রকাশক, লাস্কির সঙ্গে অর্থনীতি বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য চুক্তি করেন। এ-জন্যে তিনি অগ্রিম অর্থ নিয়ে পরে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। এভাবে তিনি সমাজতন্ত্রী হারডিঙ্কারের সঙ্গে একই আচরণ করেন। তিনি এই সমাজতন্ত্রীর সঙ্গে একটি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন এবং অগ্রিম অর্থ নেন; কিন্তু পরে আর গ্রন্থটি তাঁকে দেন নি।

কার্ল মার্কস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ দাস ক্যাপিটাল একই সঙ্গে দুটি প্রকাশনী সংস্থায় বিক্রি করেন। তাঁর ছাত্র ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস তাকে একবার লেখেন 'তুমি আসলে আবেগহীন জড়, স্বার্থপর; মনুষ্যত্ববোধহীন ও অনুভূতিশূন্য।'

কার্ল মার্কস মোসেস হেস-এর ছাত্র ছিলেন। মোসেস হেস একজন ইহুদি এবং *Rome and Jerusalem: The Last National Question*, (১৮৬২) গ্রন্থের লেখক। [এই গ্রন্থটি ছিলো ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিক ও স্পষ্ট আহ্বান। এরপর ১৮৯৫ সালে থিওডর হার্জেল এ-বিষয়ে 'ইহুদি রাষ্ট্র' গ্রন্থটি রচনা করেন।] মার্কস তাঁর গুরু মোসেস হেস-এর দ্বারা প্রভাবিত হন। [কার্ল মার্কস–তাঁর শিক্ষক বাকুনিন তাঁর সম্পর্কে এ-কথাই বলেছেন–ছিলেন তাঁর ইহুদি পূর্বপুরুষদের মতো। তিনি দাড়ি কাটতেন না এবং বাবরি রাখতেন, যেনো তিনি হিব্রুভাষী মানুষের একজন পিতৃপুরুষ।] মার্কস বলেন, আমি এই প্রতিভাকে (মোসেস হেস) আমার অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছি। কারণ, তিনি ছিলেন সূক্ষ্ম চিন্তায় সজ্জিত একজন মানুষ এবং আমার মতাদর্শের সঙ্গে তাঁর মতামত ছিলো সঙ্গতিপূর্ণ। আমি বিশ্বাস করতাম যে তিনি ছিলেন সাংগ্রামী, চিন্তক ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব [দেখুন *আত-তারিখুস সিররি লিল-আলাকাতিশ শুয়ুইয়্যাহ আস-সাহয়ুনিয়্যাহ*, নাহাদ আল-গাদেরি, পৃষ্ঠা ১৮।

১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কস কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (Manifesto of the Communist Party কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার) প্রকাশ করেন তিনি ১৮৬৭ সালে চূড়ান্ত আঙ্গিকে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দাস ক্যাপিটাল' প্রণয়ন করেন। [মার্কসের জীবন সম্পর্কে এসব কথা নিচের গ্রন্থগুলোতে দেখুন *আফয়ুনুশ শুউব*, আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, পৃষ্ঠা ২২-২৭; *আশ-শুয়ুইয়্যাহ ওয়ালিদাতুল সাহয়ুনিয়্যাহ*, আহমদ আবদুল গফুর আল-আত্তার, ৫০তম ও পরবর্তী পৃষ্ঠা; *হাযিহিশ শুয়ুইয়্যাহ*, আবদুল হাফিয মুহাম্মদ, পৃষ্ঠা ২১; *মুহাদারাতুল ইসলাম ওয়ান নাযমিল মুআসারা*, উশমাবি সুলাইমান, পৃষ্ঠা ১৬৭-১৮০; *আশ-শুয়ুইয়্যাহ ওয়াল ইনসানিয়্যাহ*, আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ]

মার্কবাদী লেখক ও 'কার্ল মার্কস' গ্রন্থের রচয়িতা ওথর্হল মার্কসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'চিরকালই তিনি ছিলেন অস্থির, বিষাদগ্রস্ত ও বিদ্বেষাপন্ন। বদহজম ও পিত্তে গলযোগের কারণে তাঁর স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে সবসময় একটা ঝুঁকি থেকে গিয়েছিলো। তিনি ছিলেন সন্দেহপরায়ণ ও বাতিকগ্রস্ত; দৈহিক উপকরণগ্রহণে অন্যান্য বাতিকগ্রস্তের মতো তিনিও বাড়াবাড়ি করতেন।'

এটা তো একটা জানা ব্যাপার যে মার্কসের দুই মেয়ে আত্মহননের মধ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় আলোচনা : **মার্কসীয় মতবাদ**

মার্কসীয় মতবাদের চিন্তামূলক মূলনীতিগুলো বিভিন্ন ঘরানার চিন্তাধারা থেকে আহৃত হয়েছে। মার্কবাদের আঁতুড়ঘর ছিলো যে-বৃহৎ চিন্তার জগৎ, তাতে ইতোপূর্বে এ ঘরানাগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে হেগেলের বুদ্ধিবৃত্তিক আদর্শবাদী/ভাববাদী চিন্তাধারা এবং অগুস্ত কোঁৎ-এর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষবাদী/দৃষ্টবাদী চিন্তাধারা। কার্ল মার্কস মানব-সমাজ ও তার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার, জন্য হেগেল থেকে গ্রহণ করেছেন প্রতিজ্ঞা ও তার বৈপরীত্যের চিন্তা (দ্বন্দ্বতত্ত্ব/ দ্বান্দ্বিক চিন্তাসূত্র)। আল্লাহ তাআলা হেগেলের কাছে হলেন 'পরম ভাব' বা 'চূড়ান্ত কারণ' এবং এটাই হলো প্রতিজ্ঞা বা দাবি। **পরম ভাব** থেকে উৎসারিত হয়েছে **সীমাবদ্ধ ভাব** বা বুদ্ধি এবং এটা হলো প্রকৃতি, যা বিপরীত প্রতিজ্ঞা বা বিপরীত দাবি। আলাদা আলাদা প্রকৃতি তাদের সত্তাসহ একত্ব অর্জনের চেষ্টায় নিরত থাকে যাতে নির্বস্তুক/বিমূর্ত ভাবের নিকটবর্তী হতে পারে। **বিমূর্ত ভাব** (একই সঙ্গে) প্রতিজ্ঞাব্যাপক ও বিপরীত প্রতিজ্ঞা অথবা দাবিব্যাপক ও বিপরীত দাবি।

বিমূর্ত ভাব পরম ভাবের পরমতা এবং প্রাকৃতিক ভাবের সীমাবদ্ধতার মধ্যে সংশ্লেষণ; অর্থাৎ চিন্তা পরম ভাব থেকে পরি সীমাবদ্ধ ভাবে বিতর্তিত হয়, তারপর সীমবদ্ধ ভাব থেকে বিবর্তিত হয় বিমূর্ত ভাবে। [*আল-ফিকরুল ইসলামি আল-হাদিস*, মুহাম্মদ আল-বাহি, পৃষ্ঠা ৩০৮, চতুর্থ মুদ্রণ]

অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে প্রয়োগ করার জন্য কার্ল মার্কস এই চিন্তাধারা গ্রহণ করেছেন। মার্কস বলেছেন, 'ভাব বিদ্যমান, কিন্তু বস্তু ভাবের আগে থেকেই বিদ্যমান; ভাব হলো আয়না, বস্তুর চেহারা তার ওপর প্রতিফলিত হয়ে ওঠে।' মার্কস আসলে বলতে চেয়েছেন, ভাবের আগেই বস্তু বিরাজমান ছিলো, সুতরাং কোনো স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই।—তিনি পবিত্র, মাহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে।—বরং তিনি বলেছেন, 'ইলাহ বা মাবুদ, দীন, সৃষ্টি, রাজনীতি ও চিন্তা মূলত ভাবের আয়নায় বস্তুর প্রতিফলন।' (অর্থাৎ, আল্লাহ বা ঈশ্বর মানুষের বস্তুগত কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।)

কার্ল মার্কস মনে করেন, অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই রাজনৈতিক প্রতিভা ও চিন্তাবিদদের জন্ম দিয়েছে। তার এই মত জোহান গোতলিব ফিখতের মতের বিপরীত। কারণ, তিনি মনে করেন, বড়ো বড়ো ব্যক্তি, রাজনীতিবিদ ও চিন্তাবিদরাই ইতিহাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছেন।

এই চিন্তার ওপর ভিত্তি করে মার্কস মনে করেন, বস্তু ও অর্থনীতিতে যে-কোনো মৌলিক পরিবর্তন অন্তর-বিশ্বের পরিবর্তনের দ্বারা

অনুসৃত হবে। কারণ, সৃষ্টিগত ও স্বভাবগতভাবে এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিক থেকে মানুষের চিন্তা ও ভাবে বস্তুরই প্রতিফলন ঘটে। সুতরাং আত্মিক উপলব্ধি এবং মানুষের চিন্তার ও অনুভূতির জগৎ মূলত উৎপাদনযন্ত্রের বিবর্তনের ফল। কারণ, সামাজিক স্তরে বস্তু নিজেকে অর্থনীতিতে প্রকাশ করে থাকে।

অর্থনৈতিক জীবনে সক্রিয় উপাদান হলো উৎপাদন-ব্যবস্থা বা উৎপাদনের হাতিয়ার। [মার্কস বলেন, বস্তুবাদী জীবনের উৎপাদন-ব্যবস্থা ব্যাপক আকারে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং চিন্তাগত জীবনের গতিপথকে স্থির করে থাকে। [তাফসিরুত তারিখ, আবদুল হামিদ সিদ্দিকি, পৃষ্ঠা ৯৬; দিরাসাতুন কুরআনিয়্যাহ, সাইয়িদ মুহাম্মদ কুতুব]

মার্কস হেগেলের একই পরিভাষাকে ইতিহাস-বিষয়ক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। যেটাকে তিনি শ্রেণি-সংগ্রাম (class struggle) বলেছেন তার ক্ষেত্রে তিনি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাকে চূড়ান্ত ও সন্দেহাতীত বলে গণ্য করেছেন।

১. **প্রাচীন নৃপতিদের সমাজ :** নৃপতিগণ ও তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গরা প্রতিজ্ঞা (দাবি), দাস-দাসী ও দরিদ্র শ্রেণি : বিপরীত প্রতিজ্ঞা (বিপরীত দাবি)।
   ওই সমাজে প্রতিজ্ঞা ও বিপরীত প্রতিজ্ঞার মধ্যে দ্বন্দের ফলে নতুন এক সমাজের সৃষ্টি হয়েছে (যেখানে প্রতিজ্ঞা ও বিপরীত প্রতিজ্ঞার সংশ্লেষণ ঘটেছে) । তা হলো সামন্তবাদী সমাজ।

২. **সামন্তবাদী সমাজ :** সামন্তপ্রভু বা জমিদার প্রতিজ্ঞা (দাবি), কৃষক শ্রেণি ওদাস-দাসী : বিপরীত প্রতিজ্ঞা (বিপরীত দাবি)।

ওই সমাজে দুটি শ্রেণির (কৃষক ও জমিদার) মধ্যে সংঘাতের ফলে উভয় পক্ষের বেঁচে যাওয়া মানুষদের নিয়ে নতুন এক সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। তা পুঁজিবাদী সমাজ। পুঁজিবাদী সমাজ গঠনে প্রতিজ্ঞা ও বিপরীত প্রতিজ্ঞার সংশ্লেষণ ঘটেছে।

৩. **পুঁজিবাদী সমাজ :** বুর্জোয়া শ্রেণি (উৎপাদন-যন্ত্রের মালিক) প্রতিজ্ঞা (দাবি), প্রলেতারিয়েত (শ্রমিক শ্রেণি) বিপরীত প্রতিজ্ঞা (বিপরীত দাবি)

বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতদের মধ্যে সংগ্রামের ফলে সম্পদ বুর্জোয়া শ্রেণির হাত থেকে শ্রমিক শ্রেণির হাতে এসেছে। তারপর সম্পদ চলে এসেছে রাষ্ট্রের হাতে। এখানে প্রতিজ্ঞা ও বিপরীত প্রতিজ্ঞার সংশ্লেষণ ঘটেছে। এই সমাজই হলো সাম্যবাদী সমাজ।

সাম্যবাদী সমাজে বিপরীত প্রতিজ্ঞার সূত্র স্থির হয়ে থাকবে। মার্কস তাই মনে করেন। কারণ, সম্পদের মালিকার বিলুপ্তি ঘটেছে যা ছিলো দ্বন্দের/সংগ্রামের কেন্দ্র এবং শ্রেণির-বিভাজনেরও বিলুপ্তি ঘটেছে, যে-কারণে দ্বন্দ্ব/সংগ্রাম অব্যাহত ছিলো। মার্কসের এই চিন্তাধারার সারসংক্ষেপ করা যায় এভাবে প্রতিটি সমাজই ধারণ করে আছে তাঁর বিপরীত প্রতিজ্ঞা, যে-বিপারীত প্রতিজ্ঞা ওই সমাজের পতন ঘটাতে পারে এবং তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। বিদ্যমান বিপরীত প্রতিজ্ঞা যে-নতুন সমাজ সৃষ্টি করবে, তাও তার ভাঁজে ভাঁজে ধারণ করবে তার বিপরীত প্রতিজ্ঞা, যে-প্রতিজ্ঞা অচিরকালের মধ্যে তার পতন ঘটাবে এবং তার স্থলাভিষিক্ত হবে। সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এভাবেই (ভাঙন ও গড়ন) চলতে থাকবে। আর সাম্যবাদী সমাজ কোনো বিপরীত প্রতিজ্ঞা ধারণ করবে না। এ-কারণে সাম্যবাদী সমাজ হবে চিরন্তন, নিরবচ্ছিন্ন এবং অবিনশ্বর।

মার্কস মনে করেন, প্রতিটি নতুন সমাজই তার আগের সমাজের চেয়ে ভালো। কারণ, নতুন সমাজ পুরনো সমাজের তুলনায় অগ্রসর। তার কারণ হলো এই, উৎপাদনের নতুন হাতিয়ার উৎপাদনের প্রাচীন হাতিয়ার থেকে উত্তম। সুতরাং এমনভিাবে তার সমাজ-ব্যবস্থাও পূর্বের সমাজ-ব্যবস্থা থেকে ভালো। এটাই হলো প্রতারণাময় বিজলিচমক, যার মাধ্যমে কমিউনিস্টরা তাদের অন্ধ অনুসারীদের চোখ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ-কারণেই আমরা দেখি, কমিউনিস্টরা যেখানেই অবস্থান তৈরি করে সেখানেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা, নৈরাজ্য ও বিপ্লব সৃষ্টি করে, যাতে তারা বিদ্যমান সমাজের পতন ঘটিয়ে তার জায়গায় নতুন প্রগতিশীল সমাজ সৃষ্টি করতে পারে।

উৎপাদনের হাতিয়ার বা উৎপাদনযন্ত্রের বিবর্তনের ফলে মানব-চরিত্রের যে-বিবর্তন ঘটে, কার্ল মার্কস তার অনেকগুলো দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রাচীন সমাজে (শিকার-সমাজ) কেবল পুরুষই সম্পদ অর্জন করতে পারতো। নারী শিকার করতে পারতো না, (ফলে সম্পদও অর্জন করতে পারতো না)। তাই সামাজিকভাবে নারীর অবস্থান ছিলো তুচ্ছ ও অসম্মানজনক। এরপর সামান্তবাদী সমাজের সূচনা হলো। এই সমাজে নারী সীমিত আকারে হলেও কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলো। ফলে তার অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটলো। কিন্তু সামন্তবাদী সমাজে অধিকাংশ কাজই পুরুষের পেশির ওপর নির্ভরশীল থাকে। এ-কারণে এই সমাজে নারী তার লৈঙ্গিক/যৌন স্বাধীনতা ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হয়; ব্যভিচারের নিষিদ্ধতার বিষয়টি উদ্ভূত হয় এবং একজন নারীর একাধিক পুরুষকে বিবাহ করা বৈধতা হারায়।

কিন্ত সমাজ যখন পুঁজিবাদী সমাজে রূপান্তরিত হলো এবং নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠলো—কারণ, পুঁজিবাদী সমাজে নারী পুরুষের মতোই পরিপূর্ণভাবে উৎপাদনন্ত্র চালাতে পারে—নারী লৈঙ্গিক/যৌন স্বাধীনতার চর্চা শুরু করলো এবং যৌনতা বৈধতা পেলো, তা আর নিষিদ্ধ বলে গণ্য হলো না।

এখানে আরেকটি সূত্র আছে। মার্কস শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবের জন্য এই সূত্রের ওপর নির্ভর করেছেন। এটা হলো উদ্বৃত্ত-সূত্র পুঁজির মুনাফা-সূত্র। মার্কস মনে করেন, মুনাফা মূলত শ্রমিকের ঘাম ও রক্তের ফসল।

সূত্র উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজির মুনাফা । শ্রমিকের কাজ বা তার উৎপাদন : শ্রমিকের মুজরি/পারিশ্রমিক। দিনের পর দিন শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা এবং অভাব বেড়েই চলেছে। অন্যদিকে পুঁজিপতিরা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে পুঁজির পাহাড় গড়ে তুলেছে। পুঁজি হলো জোঁকের মতো, তা শ্রমিকদের রক্ত চুষে নেয় এবং পুঁজিপতিদের দেহ ফাঁপিয়ে তোলে। শ্রমিকদের অভাব ও দুঃখ-দুর্দশা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌছাবে যে তার আর সীমারেখা থাকবে না। সে-সময় অভাব তাদেরকে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের মালিক বুর্জোয়া শ্রেণির বিনাশ ঘটাতে বাধ্য করবে। সে-সময়ই শ্রমিক-সমাজ (সাম্যবাদী) সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

শ্রমিক-বিপ্লব জয়ী হওয়ার পর সমাজকে বুর্জোয়াদের থেকে পবিত্র করার জন্য প্রলেতারিয়েতীয় একনায়কতন্ত্রের (D[illegible]rship)

ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়বে। এরপর যে- কোনো মূল্যে প্রলেতারিয়েতীয় একনায়কতন্ত্র অব্যাহত থাকবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দিলে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের অবসান ঘটবে। শ্রমিক-পরিষদ সমাজ পরিচালনা করবে, যে-সমাজে পুলিশ থাকবে না, সেনাবাহিনী থাকবে না বিশ্বের প্রতিটি ভূখণ্ডে সাম্রাজ্যবাদী ও বুর্জোয়া শ্রেণির বিনাশ ঘটানো এবং গোটা বিশ্বে প্রলেতারিয়েতদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনোভাবেই এবং কিছুতেই শ্রমিক-বিপ্লব থামবে না।

মার্কস মনে করেন, এই সংগ্রাম (শ্রেণি-সংগ্রাম) ঐতিহাসিক, অপরিহার্য এবং বাধ্যতামূলক; এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এই সংগ্রামই অপরিহার্যভাবে বিশ্বে শ্রমিক-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করবে। এরপর সাম্যবাদ (কমিউনিজম) প্রতিষ্ঠিত হবে জাতি সবকিছুর মালিক হবে এবং সমাজে প্রতিটি বস্তু পরিব্যাপ্ত ও বৈধ হবে, যেমন ছিলো প্রাথমিক প্রাচীন সমাজগুলোতে

মার্কস মনে করেন, প্রলেতারিয়েতদের বিজয়ের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের সব জায়গায় পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দিতে হবে এবং প্রতিশোধ-স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে হবে। এ-কারণেই বিপ্লবীর জন্য দয়া-মায়া, ভালোবাসা ও মানবিকতা মানায় না; কমিউনিস্টের সঙ্গেও এসব গুণাবলি একত্র হতে পারে না। মার্কস ও তাঁর শিষ্যরা এটাই বিশ্বাস করেন।

আমার উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেখার জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলোর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে

১. *আল-ফিকরুল ইসলামিয়্যুল হাদিস ওয়া সিলাতুহু বিল-ইসতিমারিল গারবিয়্যি*, মুহাম্মদ আল-বাহি, পৃষ্ঠা ২০০ থেকে পরবর্তী

২. *আত-তাফসিরুল ইসলামি তিত-তারিখ*, ড. ইমাদুদ্দিন খলিল।

৩. *নাকযু আওহামিল জাদালিয়্যাতিল মাদ্দিয়্যা*, মুহাম্মদ সাঈদ রমজান আল-বুতি, পৃষ্ঠা ৭ থেকে পরবর্তী।

৪. *খাসায়িসুত তাসাওউরিল ইসলামি*, সাইয়িদ কুতুব, 'আল-ইজাবিয়্যাহ' পরিচ্ছেদ

কার্ল মার্কস বলেছেন, শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান থেকে বঞ্চিত মানুষের অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ না হয়ে উপায় নেই। এবং তাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য। তাদের বিজয়ের মধ্য দিয়েই বিপ্লব ও শ্রেণি-সংগ্রাম এবং (বৈষম্যমূলক) অন্য যা-কিছু আছে তার অবসান ঘটবে। শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে এসব কর্মতৎপরতার প্রেরণা ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের আদর্শ নয়; বরং তা চূড়ান্ত নেতিবাচ আদর্শ...শত্রুতার আদর্শ। [দেখুন *আত-তাফসিরুত তারিখি*, আবদুল হামিদ সিদ্দিকি, পৃষ্ঠা ২১২, *নিউ হোপস ফর আ চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড*, বার্ট্রান্ড রাসেল, পৃষ্ঠা ২৮৬ থেকে উদ্ধৃত।

জার্মান অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক বিপ্লবী মার্কসের (Karl Heinrich Marx) প্রণীত তত্ত্বই পরবর্তীকালে গোটা বিশ্বে মার্কসবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি তাঁর অধিকাংশ তত্ত্ব দাঁড় করান। ১৮৩৫ সাল থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত তিনি বার্লিন ও বন শহরে আইন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালে হেগেলের দর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। ১৮৪১ সালে তিনি দর্শন শাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪২ সালে মার্কস 'রাইনিখে সাইটং' (Rheinische Zeitung /Rhineland News) নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। অর্থনীতি ও ইতিহাস বিষয়ে কঠোর সমালোচনামূলক নিবন্ধ প্রকাশের জন্য তিনি প্রুশিয়ার শাসকদের বিরাগভাজন হন। ১৮৪৩ সালে তারা পত্রিকাটিকে নিষিদ্ধ করলে কার্ল মার্কস সপরিবারে প্যারিসে চলে যান। ১৮৪৫ সালে পাড়ি জমান ব্রাসেলসে। ১৮৪৭ সালে চলে আসেন লন্ডনে। ইতোমধ্যে তাঁর ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁদের এই পরিচয় গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত এবং তা আজীবন টিকে ছিলো। ১৯৪৭-৪৮ সালের মধ্যে মার্কস ও এঙ্গেলস যৌথভাবে বিশ্বের শ্রমজীবী ও বিপ্লবীদের জন্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেন। ১৮৪৭ সালে ইউরোপজুড়ে বিপ্লবের সূচনা হলে মার্কস তাঁর দেশের মাটিতে ফিরে আসেন। কিন্তু জার্মান গণতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে তিনি স্থায়ীভাবে ইংল্যান্ডে চলে যান। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ওখানেই ছিলেন।

১৯৬৪ সালে তিনি **'ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল'** বা **'প্রথম আন্তর্জাতিক'** গড়ে তোলেন। কিন্তু এই সংগঠনের অন্যতম নেতা মিখাইল বাকুনিনের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিয়ে এটি ভেঙে যায়। ১৮৬৭ সালে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'ডাস কাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর এই দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন যথাক্রমে এঙ্গেলস ও কার্ল কাউটস্কি।

মার্কসবাদের মূল বক্তব্য হলো, ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত বিরোধ ও সঙ্কটই ডেকে আনবে তার পতন। পর্যায়ক্রমে গড়ে উঠবে কমিউনিজম বা সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা। রাষ্ট্র হচ্ছে শোষণের যন্ত্র। তাই শ্রেণিহীন সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমেই শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও শ্রেণিশোষণের অবসান সম্ভব। শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবই সেই নতুন সমাজ গঠনের একামাত্র উপায়। বিপ্লব ছাড়া স্বয়ংক্রিয় সামাজিক পরিবর্তনের পথে এই গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

[২] জায়নিস্ট/ইহুদিবাদী নেতাদের প্রটোকলস। ১৯০৫ সালে এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

[৩] চার্লস রবার্ট ডারউইন (Charles Robert Darwin) একজন ব্রিটিশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী। তিনি 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (Natural Selection) মতবাদের প্রবক্তা। ১৮৩১ সালে তিনি এইচএমএস বিগল নামক জাহাজে চড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও দ্বীপাঞ্চল ভ্রমণ করেন। এ-সময় তিনি অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করেন এবং অভিনিবেশসহ প্রকৃতি, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা ও তাদের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ করেন। পরবর্তী সময়ে সংগৃহীত এসব নমুনার বৈশিষ্ট্য দেখে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে 'On the Origin of Species by Means of Natural Selection' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সংক্ষেপে তাঁর এই তত্ত্বকে 'প্রজাতির উদ্ভবতত্ত্ব' বলা হয়। গ্রন্থটি ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি জীবজগতের বিবর্তন এবং নতুন একটি প্রজাতির উদ্ভব কীভাবে ঘটে বা ঘটতে পারে সে-বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা দেন এবং তার সপক্ষে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করেন। এ-সময় থেকেই তাঁর না সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং বিবর্তনবাদের জনক হিসেবে তিনি পরিচিতি পান। চার্লস ডারউইন ১৮০৯ সালে লন্ডনের শ্রুসবেরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে সমাহিত করা হয়।

[৪] ভাববাদী জার্মান দার্শনিক ফ্রিডরিখ ভিলহেল্ম নিটশে (Friedrich Wilhelm Nietzsche) ১৮৪৪ সালের ১৫ই অক্টোবর জার্মানির প্রুশিয়ার অন্তর্গত রকেন গ্রামের এক প্রোটেস্টান পুরোহিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বন ও লাইপৎগিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধ্রুপদী ভাষাবিদ্যার মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ভাষাবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, রাষ্ট্র ও আইনের সমস্যাবলিতেও তাঁর আগ্রহ দেখা যায়।

প্রচলিত নৈতিক ধারণা সম্পর্কে নিটশের অবজ্ঞা সর্বজনবিদিত। তাঁর দর্শন স্বাতন্ত্র্যবাদী, অতিমানবে বিশ্বাসী, সাম্যবাদের বিরোধী ও খ্রিস্টধর্মের পরিপন্থী। সমাজতন্ত্রে আতঙ্ক, জনগণের প্রতি ঘৃণা, যে-কোনো মূল্যে পুঁজিবাদী সমাজের অনিবার্য বিনাশ প্রতিরোধের প্রয়াস হিসেবে তাঁর মতবাদ চিহ্নিত হয়ে আসছে।

নিটশের দর্শনের মূলকথা হলো, প্রকৃতি ও প্রাণিজগতে নিরন্তর আত্মরক্ষা ও বাঁচা-মরার সংগ্রাম চলছে। এর ফলে দুর্বলের ওপর সবল ক্ষমতাবিস্তারে

অগ্রহবোধ করে। তাই শোষক, শাসিত বা দাস, প্রভু এগুলো প্রকৃতিগত বিষয়। জীবমাত্রেরই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হলো শোষণ করা আবার বাঁচার সংগ্রামে পরাজিত পক্ষের অনিবার্য নিয়তি হলো দাস হওয়া। পরাজিতের পক্ষে দাসত্ব স্বীকার করার অর্থ হলো বাস্তব সত্যকে মেনে নেওয়া। তিনি বলেছেন, শ্রমিক শ্রেণিকে বশে রাখতে হলে তাদের মধ্যে দাসত্বের মনোভাব এবং পুঁজিবাদী প্রভুদের মধ্যে প্রভুত্বের মনোভাব জাগিয়ে রাখতে হবে। তাঁর মতে, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অবাধ ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

বিশ শতকে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদী রাজনীতির উত্থানের পেছনে নিট্‌শের দর্শনের প্রভাব ছিলো বলে ধারণা করা হয়। তাঁর রচনাবলিতে কবিত্বময়তা ও আবেগপূর্ণ স্নিগ্ধ মাধুর্যের পাশাপাশি ব্যাধিগ্রস্ত মনের সংবেদনশীলতাও লক্ষণীয়: 'জরথুস্ত্রের বাণী' 'ভালোমন্দের অতীত', 'নীতির পরিবর্তন' এবং 'খ্রিস্ট-বিরোধী' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। নিট্‌শে ১৯০০ সালে ২৫ শে আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

মার্কস ও ভন ওয়েস্টফ্যালেন দম্পত্তির ছিলো সাত কন্যা সন্তান জেনি ক্যারোলিন (১৮৪৪-১৯৮৩); জেনি লরা (১৮৪৫-১৯১১); এডগার (১৮৪৭-১৮৫৫); হেনরি এডওয়ার্ড গাই (১৮৪৯-১৮৫০); জেনি এভেলিন ফ্রান্সেস (১৮৫১-১৮৫২); জেনি জুলিয়া এলিনোর (১৮৫৫-১৮৯৮) এবং আরেকটি সন্ত ন নাম রাখার আগেই ১৮৫৭ সালে মৃত্যুবরণ করে। সাত সন্তানের মধ্যে মাত্র তিনজন পরিণত বয়সে পৌঁছতে পেরেছিলেন। অভিযোগ করা হয়ে থাকে, মার্কসের গৃহপরিচারিকা হেলেনে ডিমাথের সঙ্গে তাঁর একটি বিবাহবহির্ভূত ছেলে ছিলো। ছেলের নাম ফ্রেডি।

কার্ল মার্কসের দরিদ্রতা সম্পর্কে আরো একটি গল্প চালু আছে তাঁর ছিলো একটিমাত্র প্যান্ট। বসতে বসতে দুই নিতম্বের কাছে প্যান্টটি ছিঁড়ে গিয়েছিলো। ছেঁড়া অংশটিতে তিনি তালি লাগান নি; তাই কোনো অতিথি এলে তিনি দেখা করতে যেতেন না।

ফ্রিডরিখ এঙ্গেল্‌স (Friedrich Engels) জার্মান সমাজতন্ত্রী, সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক। পরবর্তী কালে বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসেবে স্বীকৃত। কার্ল মার্কসের সঙ্গে যৌথভাবে মার্কসবাদ হিসেবে পরিচিত বিপ্লবী সমাজতাত্ত্বিক দর্শনের উদ্ভব, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা অনন্য।

এঙ্গেল্‌স ১৮২০ সালে ২৮ শে নভেম্বর এক ধনাঢ্য জার্মান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক ব্যবসা দেখাশোনা করার জন্য ১৮৪২ সালে ইংল্যান্ডে যান। পাশাপাশি সাংবাদিকতার কাজও চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৮৪৪ সালে মার্কসের সঙ্গে এঙ্গেল্‌সের পরিচয় ঘটে। এই বন্ধুত্ব এক পর্যায়ে কিংবদন্তিতুল্য নিবিড় বন্ধুত্বে রূপ নেয়। ১৮৪৫ সালে এঙ্গেল্‌সের 'দ্য কন্ডিশন অব দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। মার্কস ও তাঁর যৌথ প্রচেষ্টার ফসল 'জার্মান আইডিওলজি (১৮৪৫)। এটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। তাঁদের যৌথ মেধার আরেকটি ফসল 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' (১৮৪৮)। এর মধ্য দিয়েই তাঁরা প্রথম ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনে শ্রমিক-শ্রেণির বৈপ্লবিক ভূমিকার কথা, ধনতন্ত্রবাদের গর্ভ থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্মের কথা তুলে ধরেন।

সাধারণভাবে এঙ্গেলস কার্ল মার্কসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত হলেও ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, বিপ্লব ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সম্পর্কে তার নিজস্ব চিন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে পরিগণিত হয়। মার্কসীয় চিন্তাধার মূলত মার্কস ও এঙ্গেল্‌সের যৌথ চিন্তা ও শ্রমের ফসল।

এঙ্গেল্‌সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'এন্টিডুরিং' (Anti-Dühring Herr Eugen Dühring's Revolution in Science), The Origin of the Family, Private Property and the State এবং Socialism: Utopian and Scientific.

১৮৯৫ সালের ৫ই আগস্ট লন্ডনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মূল গ্রন্থ Der Judenstaat (The Jews' State)।

abdussattaraini@gmil.com

ইমাম ও খতিবদের জন্য

ইসলামবাগ মাদরাসার প্রিন্সিপাল,
মুফাচ্ছিরে কুরআন, প্রখ্যাত ওয়ায়েজ
শায়খুল হাদিস
মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী
রচিত সাড়া জাগানো বই
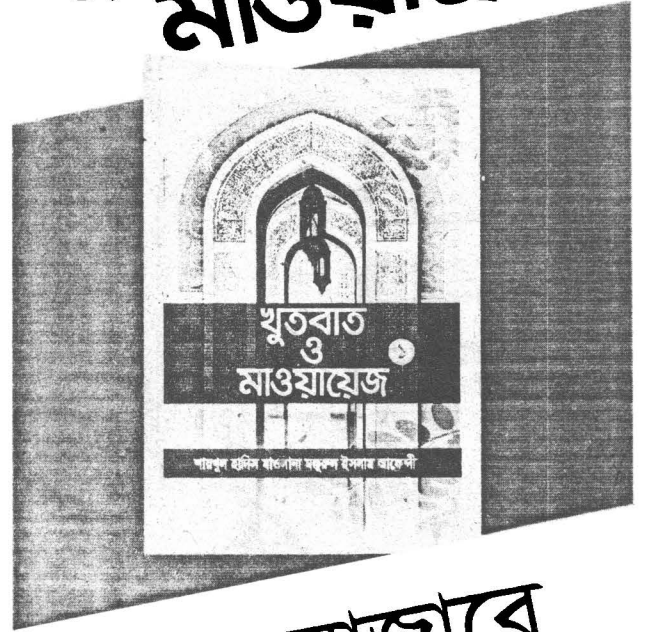
প্রাপ্তিস্থান
নাদিয়াতুল কুরআন ফাউন্ডেশন
৫০ পাঠকবন্ধু মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯১৮৬৭৫০৬০

জামিয়া ইসলামিয়া ইসলামবাগ ঢাকা
মোবাইল : ০১৯১৪০৩০৮১৩

AHG
Al-Hamra Group

আল-হামরা গ্রুপ
AL-HAMRA GROUP

"আল-হামরায় বিনিয়োগ হালাল ও লাভজনক বিনিয়োগ"

বিনিয়োগের বিশ্বস্ত ঠিকানা

আল জাজিরা প্লাষ্টিক র‍্যাক
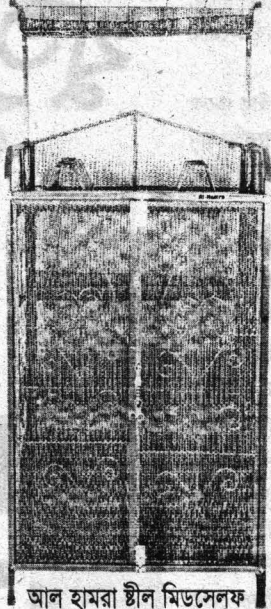
আল হামরা ষ্টীল মিডসেলফ

ABCI বেবী সাইকেল

আমাদের শো-রুম ঃ
নূরানী সেন্টার
ইমামগঞ্জ, ঢাকা

শীঘ্রই উদ্বোধন
নোয়াখালী চৌমুহনী,
মজুমপুর গেট কুষ্টিয়া

লাখপ্রতি বিনিয়োগে প্রতি মাসে-
সর্বনিম্ন ২০০০ টাকা
লভ্যাংশের অংশ থেকে উত্তোলন এর সুযোগ
এবং বছর শেষে অবশিষ্ট লভ্যাংশ প্রদান।

আমাদের প্রতিষ্ঠান সমূহ
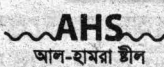
কর্পোরেট অফিসঃ ১৩/০৩/০১ আর.এন.ডি রোড, শহীদ নগর, ৯নং গলি, লালবাগ কেল্লার মোড়, ঢাকা-১২১১
মোবাইল ঃ ০১৭৫৬ ৩৩৫৮২৮, ১৬৭৩ ৩৯৩৩০৮, ০১৮২৭ ৫৪২৯৫৩

চরিত্র বদলানোর কিছু উপায় ও উপকরণ

মুখলেসুর রহমান হাবিব

কেউ কেউ ধারণা করে, মানুষের চরিত্র অপরিবর্তনীয়, তা পরিবর্তন করা যায় না; চরিত্র বদলানো সম্ভব না । কিন্তু সত্যি হচ্ছে, চরিত্র পরিবর্তনশীল। ভালো-মন্দ যে কোনো চারিত্রিক গুণ অর্জন করা অথবা বর্জন করা দু'টোই সম্ভব। মানুষ চেষ্টা করে ভালো হতে পারে, খারাপও হতে পারে। চরিত্র বদলানো সম্ভব না হলে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের অসংখ্য উপদেশ, আলেমগণের ওয়াজ-নসিহত-বক্তৃতা, গুণীজনের বাণী, নীতিকথা সবই বৃথা যাবে; অসার, নিরর্থক প্রমাণিত হবে।

কুরআনের কোমল-মধুর-মিষ্টি বাণী ও হাদিসের সুন্দর সুন্দর উপদেশমালা শোনে, রাসূল (সা)-এর পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করে, যুগে যুগে, অজস্র অগণিত বিপথগামী মানুষ হিদায়াত লাভ করেছে। অন্ধকার ছেড়ে আলোর পথে এসেছে। অশ্লীল চরিত্রহীন জীবন ত্যাগ করে আদর্শ সৎ জীবনযাপন অবলম্বন করেছে। আজো সেই পবিত্র ধারা অব্যাহত আছে, ও অব্যাহত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। মানুষ মন্দ ছেড়ে ভালো গ্রহণ করছে, সুন্দরকে আলিঙ্গন করছে। চরিত্র বদলাচ্ছে। এর উল্টো দিকও আছে, ভালো মানুষ খারাপ হচ্ছে, ও বেশ হচ্ছে। পরিবেশের প্রভাবে বা অন্য কোনো কারণে অথবা অকারণে মানুষ দলে দলে খারাপের দিকে এগুচ্ছে। সভ্য চরিত্রবানরা, অসভ্য চরিত্রহীন হয়ে পড়ছে। চরিত্র পরিবর্তনশীল।

শুধু মানুষ নয়, বিভিন্ন জীব-জন্তুর মধ্যেও এই চারিত্রিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আমরা দেখি বিভিন্ন বনোপ্রাণী তার বন্যস্বভাব ছেড়ে মানুষের পোষ মানে। বনো হাতি তার মালিকের কথামতো কাজ করে। এমনকি বাঘ, সিংহ, বাজ, চিল এই জাতীয় হিংস্র প্রাণীও তাদের হিংস্রতা ভুলে নিজের স্বভাবচরিত্র ত্যাগ করে মানুষের সঙ্গে বসবাস করে, তাদের পোষ গ্রহণ করে। মালিককে আক্রমণ করে না । তাহলে মানুষ কেন তার চরিত্র বদলাতে পারবে না। চর্চা ও সাধনার মাধ্যমে যেকোনো চরিত্র বদলানো ও পরবর্তন করা সম্ভব। পূর্বে আলোচনা হয়েছে, মানুষের স্বভাবচরিত্র বা জন্মগত বৈশিষ্ট্য খুব একটা বদলায়না, বদলানো যায় না সহজে। তবে সাধনা করলে এটাও বদলানো সম্ভব। চেষ্টা ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে মানুষ তার জন্মগত গুণ ও স্বভাব, যদিও বেশ কঠিন, পরিবর্তন করতে পারে।

এক্ষেত্রে কিছু উপায়, পদ্ধতি ও ব্যবস্থা আছে, যা অবলম্বন করে মানুষ তার চরিত্র বদলে দিতে পারে। মন্দ, অশালীন, নোংরা ও খারাপ গুণাবলী পরিত্যাগ করে আদর্শ, সৎ, শালীন ও রুচিবোধসম্পন্ন, উদার, মহৎ ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে। তাই চরিত্র পরিবর্তনে সহায়ক এমন কিছু উপায় ও উপাদান নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

ঈমান ও আকিদা

মু'মিনের চরিত্র গঠনের প্রধান অবলম্বন ও মাধ্যম তার ঈমান। ঈমান ও আকিদা বা অন্যভাষায় ইসলামের যে বিশ্বাসের জগতটা আছে, তা মু'মিনের চরিত্র বিনির্মাণে বড় ভূমিকা রাখে। বিশ্বাস মানুষের চিন্তা ও কর্মে প্রভাব ফেলে। তার আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। কল্যাণ ও ভালোর প্রতি বিশ্বস্ত ও মঙ্গলের দিকে ধাবিত করে; মন্দের প্রতি বিশ্বাস, খারাপের দিকে নিয়ে যায়।

যার ঈমান যতো গভীর, তার আখলাক ততোই সুন্দর। দৃঢ় ঈমানদার মহৎ গুণের অধিকারী। মজবুত আকিদা ও বিশ্বাস, উত্তম চরিত্র জন্ম দেয়। আবু বকর রা.-এর ঈমান সবচেয়ে দৃঢ় ও পরিপূর্ণ, তার চরিত্রও সকলের থেকে উন্নত ও মহিমামণ্ডিত। রাসূল সা. সৃষ্টির সেরা ঈমানদার, উত্তম চরিত্র ও মহৎ গুণের দিক দিয়ে তিনি সৃষ্টির সেরা মানব।

ঈমান ও আকিদার সঙ্গে আখলাকের সম্পর্ক, যেমন দেহের সঙ্গে আত্মার অথবা পানির সঙ্গে মাছের সম্পর্ক। একারণেই রাসূল (সা) চমৎকার বলেছেন :

أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا

'মু'মিনদের মধ্যে ওই ব্যক্তির ঈমান পরিপূর্ণ, যার আখলাক ভালো ও চরিত্র সুন্দর।'১

মু'মিন যখন প্রাণপণে বিশ্বাস করে, আল্লাহর প্রতি, পরকাল বা মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রতি, জান্নাতের সুখ ও জাহান্নামের শাস্তির প্রতি, যখন সে বিশ্বাস করে দুনিয়াতে যাকিছু করছে, একদিন তার প্রতিফল ভোগ করতে হবে, ও মহান আল্লাহর কাছে তার জবাবদিহি করতে হবে; তখন স্বাভাবিকভাবেই তার চরিত্রে

পরিবর্তন আসে। তার কর্মে ও আচরণে সেই পরিবর্তনের লক্ষণ ফুটে ওঠে। একজন কাফের যখন ঈমান গ্রহণ করে, তখন তার মধ্যে অন্যান্য পরিবর্তনের পাশাশি চারিত্রিক পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। মু'মিন- অবশ্যই সত্যিকার দীনদার মু'মিন ও কাফের একসঙ্গে বসবাস বা অবস্থান করলে সেখানেও তাদের চালাফেরা ও আচরণ দেখে বোঝা যায়, কে ঈমানদার, কে ঈমানদার নয়।

এই বদ্ধমূল ঈমান ও বিশ্বাসের প্রভাবে মানুষ মন্দের বিপরীতে ভালো গ্রহণ করে, পাপ, অশ্লীলতা ছেড়ে সৎ কাজে মশগুল হয়। মানুষের ক্ষতি না করে তার উপকার করার চেষ্টা করে, অসহায়ের পাশে দাঁড়ায়, আল্লাহর শাস্তির ভয়ে অন্যের প্রতি জুলুম ও অন্যায় আচরণ পরিত্যাগ করে। তখন তার মধ্যে যেন রাসূল সা.-এর ওই হাদিসেরই বাস্তব প্রয়োগ ও প্রতিফলন ঘটে-

أحبّ الناس إلى الله أنفعهم للناس. و أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. و لأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا

'আল্লাহর কাছে সে বেশি প্রিয়, যে মানুষের বেশি উপকার করে। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ইবাদত হচ্ছে, একজন মুসলিমের হৃদয়ে আনন্দ দেয়া, তার বিপদ, কষ্ট বা উৎকণ্ঠা দূর করা, অথবা তার ঋণ শোধ করা, কিংবা তার ক্ষুধা দূর করা। আমার কোনো ভাইয়ের কাজে তার সাথে একটু হেঁটে যাওয়া আমার কাছে এই মসজিদে (মদিনার মসজিদে নববী) এক মাস ই'তিকাফ করার চেয়েও বেশি প্রিয়।'২

অন্য হাদিসের ভাষায় 'প্রকৃত মুসলিম সে, যার হাত ও মুখের ক্ষতি থেকে অপর মুসলিমরা নিরাপদে থাকে।'৩

কিন্তু যার হৃদয়ে ঈমানের আলো নেই, যে এই মহামূল্যবান সম্পদ থেকে বঞ্চিত, সে কুরআনের ভাষায়, পশুর মতো বা তার থেকেও নিকৃষ্ট!৪ সে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। সমস্ত অন্যায়, পাপ, অশ্লীলতা তার চোখে বৈধ ও মামুলি বলে মনে হয়। কুফরের অন্ধকারে তার হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে অন্যায়ের প্রতি সে উৎসাহিত হয়, তার মধ্যে অপরাধবোধ লোপ পেয়ে যায়; কারণ মৃত্যু পরবর্তী জীবনে তার বিশ্বাস নেই, জাহান্নামের শাস্তির ভয় নেই, জান্নাতের সুখস্বপ্নও নেই, আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার অনুভূতি তার হৃদয়ে অনুপস্থিত। তাই খুন, ব্যভিচার, ধোঁকা, মদ্যপান, মিথ্যাসহ সব ধরণের পাপ ও অন্যায় তার কাছে তুচ্ছ, নগণ্য ও সাধারণ বিষয়। এজন্যেই সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ রা. বলেছেন,

'মু'মিন ব্যক্তি তার পাপসমূহকে এতো বিরাট ও গুরুতর অপরাধ মনে করে যে, যেন সে একটা পাহাড়ের নিচে বসে আছে, এবং আশংকা করছে পাহাড়টি তার উপর ধ্বসে পড়বে। আর পাপী ব্যক্তি তার অন্যায়সমূহকে মাছির মতো তুচ্ছ ও হাল্কা মনে করে, যে মাছি তার নাকে এসে বসে আবার উড়াল দিয়ে চলে যায়।'৫

পবিত্র কুরআনে আরও সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে :

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ.

'যারা এটা (কিয়ামত) বিশ্বাস করে না, তারাই এটা তরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী, তারা একে ভয় করে এবং জানে যে এটা সত্য।'৬

কিয়ামত সত্যি-ই সংঘটিত হবে, না-কি এটা মিথ্যা ও কাল্পনিক, এ বিষয়ে মু'মিন ও কাফেরের মনোভাব ও দৃষ্টভঙ্গি দু'রকম। কাফের এটা বিশ্বাস করে না, সে মনে করে কিয়ামত মিথ্যা ও কাল্পনিক। এজন্যে এনিয়ে তার বিশেষ ভাবনা নেই, প্রস্তুতিও নেই। সে দ্রুত কিয়ামতের আগমন কামনা করে, সে বলে, কিয়ামত যদি সত্য হয় তাহলে এখনই তা সংঘটিত হোক! এটা তার উপহাস, কিয়ামতের ব্যাপারে তার অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের অংশ হিসেবে সে এমন কথা বলে; কারণ এর প্রতি তার ঈমান নেই, বিশ্বাস নেই। কিন্তু মু'মিন সবসময় কিয়ামত নিয়ে ভাবে, তার ভয়ে তটস্থ থাকে; কারণ সে এটা সত্য বলে বিশ্বাস করে। এর প্রতি তার ঈমান আছে। এজন্যে সে এর দ্রুত আগমন কামনা করে না, বরং তার জন্যে প্রস্তুতি নেয়, তার বিভীষিকা ও ভয়াবহ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্যে চেষ্টা করে। এর প্রতি তার ঈমান ও বিশ্বাসই তা করতে তাকে বাধ্য করে ও উৎসাহিত করে। মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে চরিত্রগত ও আচরণগত এই বৈপরিত্ব ও বিভাজন সৃষ্টির মূল কারণ, তাদের বিশ্বাস ও আকিদা। ঈমান মু'মিনের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে, তাকে আলোকিত পথে পরিচালিত করে ও সাফল্যের গন্তব্যে নিয়ে যায়।

দো'আ

দো'আ'র মাধ্যমে ভালো গুণ লাভ করা যায়, চরিত্র অর্জন করা যায়। দো'আ অর্থ, আল্লাহর কাছে চাওয়া। মগ্ন হৃদয়ে, প্রবল আগ্রহ নিয়ে, অতিশয় বিনয় ও ভক্তি সহকারে বান্দা যখন তার রবের কাছে কিছু চায়, এবং নিরাশ না হয়ে তা পাবার আশা করে, তখন দয়াময় আল্লাহ তার আশা পূরণ করেন, তার কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি তাকে দান করেন। বিশেষ করে তা যদি হয় দীনী ও ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়, তাহলে আল্লাহ তাকে তৌফিক দেন, ওই কাজের সুযোগ করে দেন। তাকে হতাশ করেন না। কেউ যদি হজ্ব করার ইচ্ছে করে ও দো'আ করে, তার হজ্ব করবার তৌফিক হয়। শেষ রজনীতে বিছানা ছেড়ে তাহাজ্জুদ পড়বার ইচ্ছায় দো'আ করলে, সময়মতো চোখ খুলে যায়। তাহাজ্জুদ পড়বার সুযোগ হয়।

মহৎ গুণাবলী অর্জন ও ভালো চরিত্র ধারণ করা বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়, তার অসীম দয়া, ক্ষমা ও করুণা লাভ করার বড় অবলম্বন। মু'মিনের উচিৎ এই মহান ইবাদত হাসেলের জন্যে আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করা। খারাপের বদলে ভালোগুণাবলী অর্জন করার উদ্দেশ্যে সবসময় দো'আ করা। আল্লাহ এই দো'আ কবুল করেন। তিনি বলেন :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

'এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তাদেরকে বলে দাও, নিশ্চয় আমি সন্নিকটবর্তী; কোনো আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহবান করে, তখনই আমি তার আহবানে সাড়া দিয়ে থাকি; সুতরাং তারাও যেন আমার আহবানে সাড়া দেয় এবং আমাকে বিশ্বাস করে, তাহলেই তারা সঠিক পথে চলতে পারবে।'৭

রাসূল সা. যিনি চরিত্রের জগতে সৃষ্টির সেরা মহাপুরুষ, যার গুণের মহিমা ও চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বয়ং আল্লাহ তার পবিত্র গ্রন্থে ঘোষণা করেছেন। সেই মহান ব্যক্তি- আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সা.ও দো'আ করেছেন, আল্লাহর কাছে উত্তম গুণাবলী লাভ করা ও খারাপ গুণ ত্যাগ করার তৌফিক কামনা করেছেন। তিনি দো'আ করতেন

اللهم اهدني لصالح الأخلاق. فإنه لا يهدي لصالحها و لا يصرف سيئها إلا أنت اللهم إني أعوذبك من منكرات الأخلاق و الأعمال و الأهواء. اللهم آت نفوسنا تقواها. و زكها أنت خير من زكاها

'হে আল্লাহ! আমাকে উত্তম ও সৎ গুণাবলীর দিকে পথ দেখাও; ভালো চরিত্র লাভ করবার পথনির্দেশ ও খারাপ চরিত্র থেকে বিরত রাখবার ক্ষমতা তুমি ছাড়া অন্য কারো যে নেই।' ৮

'হে আল্লাহ! সকল অসৎ চরিত্র ও গুণাবলী এবং সকল খারাপ কাজ ও মনোবাসনা থেকে আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি।'৯

'হে আল্লাহ! আমাদের হৃদয়সমূহে তাকওয়া দান করো, ও পবিত্র পরিশুদ্ধ করো; কেননা তুমিই উত্তম ও শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী ।'১০

চর্চা ও সাধনা

মানুষ নিয়মিত চর্চা ও সাধনা করে ভালো গুণ অর্জন করতে পারে। সাধনা খারাপ লোক'কে সৎ, ধার্মিক ও মহৎ করে তোলে। চেষ্টা ও অনুশীলন ব্যক্তির কাছে যা নেই তা এনে দেয়। একারণে কেউ যদি চায়, সে চরিত্রবান হবে, গুণীজনদের একজন হবে, তাহলে তার উচিৎ সাধনা করা, চর্চা ও অনুশীলন অব্যাহত রাখা। আল্লাহ বলেন

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

'যারা আমার উদ্দেশে সংগ্রাম করবে, শ্রম ব্যয় করবে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো।'১১

রাসূল সা. বলেছেন :

العلم بالتعلم , و الحلم بالتحلم , و من يتحر الخير يعطه , و من يتوق الشر يوقه.

'এলম অর্জন হয় এলমের চর্চা ও সাধনার দ্বারা, ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণ লাভ হয় অনুশীলনের মাধ্যমে, যে ব্যক্তি কল্যাণ লাভে সচেষ্ট হয়, সে তা লাভ করে এবং যে অকল্যাণ থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে সে তা থেকে বাঁচতে পারে।'১২

তিনি আরও বলেছেন 'যে অন্যকে ধরাশায়ী করে, সে আসল শক্তিশালী নয়, প্রকৃত শক্তিশালী ওই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে।'১৩

এই হাদিস দু'টি থেকে বোঝা যায় যে, মানুষ চর্চা ও সাধনা কেরলে অনেক কিছু তার হাসেল হয়। যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে নেই, তা সে লাভ করতে পারে ।

সৎ সঙ্গ ও সুস্থ পরিবেশ

চরিত্র বদলানোর ও পরিবর্তন করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় ভালো সঙ্গ ও পরিবেশ। ভালো সঙ্গ ও পরিবেশে গেলে, মানুষ ভাল হয়ে যায়। খারাপ পরিবেশে থাকলে, খারাপ হয়ে যায়। এটা স্বাভাবিক বিষয়। এর ব্যতিক্রম খুব একটা দেখা যায় না।

চরিত্র গঠন ভালো গুণাবলী অর্জনের ক্ষেত্রে সঙ্গ ও পরিবেশের বড় ভূমিকা রয়েছে। কুরআন ও হাদিসে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মু'মিনের ঈমান, আমল ও আখলাক যেন ভালো থাকে, সুস্থ ও বিশুদ্ধ থাকে, সেজন্যে ভালো সঙ্গ ও সুস্থ ধর্মীয় পরিবেশ গ্রহণ করতে তাকে বরাবর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।'১৪

রাসূল সা. বলেছেন 'মানুষ তার সাথী বা বন্ধুর চরিত্র ও অভ্যাস গ্রহণ করে, সুতরাং তোমরা বুঝেশুনে সাথী ও বন্ধু গ্রহণ করবে।'১৫

তিনি আরও বলেছেন

مثل الجليس الصالح كمثل العطار. إن لم يعطك من عطره أصابك من ريحه

'ভালো, সৎ সঙ্গী আতর বিক্রেতার (সুগন্ধিদ্রব্যবিক্রেতা) মতো, যদি সে তোমাকে তার আতর বা সুগন্ধি থেকে কিছু না-ও দেয়, তুমি তার সুবাস তো পাবে।'১৬

অন্য বর্ণনায় এসেছে 'সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ সুগন্ধি বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের মতো। সুগন্ধি বিক্রেতা থেকে তুমি রেহাই পাবে না; হয় তুমি সুগন্ধি ক্রয় করবে, না হয় তার সুঘ্রাণ পাবে । আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার উৎকট দুর্গন্ধ পাবে।'১৭

উত্তম চরিত্রের ইতিবাচক দিকগুলোয় দৃষ্টি দেয়া

সুন্দর গুণাবলী ও ভালো চরিত্র অর্জনের আরেকটি মাধ্যম হচ্ছে, উত্তম চরিত্রের ইতিবাচক দিকগুলোয় দৃষ্টি দেয়া। এর শুভ পরিণতি ও ফলাফল সম্পর্কে ভাবা। এটা স্মরণ করা যে, গুণীজন ও মহৎ চরিত্রবান ব্যক্তিরা অজস্র কল্যাণ ও বিপুল সৌভাগ্য লাভ করেন। মানুষের চোখে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হন। সবার কাছে সবসময় স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকেন।

ইসলামে উত্তম চরিত্রকে মযাদাপূর্ণ ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কুরআন ও হাদিসের আলোকে এটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। আল্লাহ ও তার রাসূলের কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল। মিযানে উত্তম চরিত্রের ওজন অন্য যেকোনো আমল থেকে অনেক বেশি ওজনদার হবে। এটা জান্নাতে প্রবেশের বড় মাধ্যম। চরিত্রের মর্যাদা ও গুরুত্বের অধ্যায়ে এই বিষয়ে তথ্য-প্রমাণসহ দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে।

উত্তম চরিত্রের সাওয়াব ও পুরস্কার এবং পরকালীন কল্যাণ ও সাফল্যের পাশাপাশি দুনিয়াতেও তার বেশ মঙ্গলজনক দিক রয়েছে। মহান আল্লাহ এর বিনিময়ে বান্দাকে দুনিয়াতে এমন কিছু নিয়ামত ও প্রাচুর্য দান করেন, যা অন্য কিছুর দ্বারা লাভ হয় না। মানুষ তার ভালো গুণ ও সুন্দর আখলাকের কল্যাণে দুনিয়াতে যেসব উপকার লাভ করে, তা মৌলিকভাবে তিন ধরণের।

এক, আল্লাহর দয়া, করুণা ও সাহায্য হাসেল হয়। বান্দা যখন অন্যকে দয়া করে, অন্যের উপকার করে, আল্লাহ তাকে দয়া ও উপকার করেন, তাকে সাহায্য করেন। হাদিসের ভাষায়, 'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, তাহলে আকাশের অধিপতিও তোমাদেরকে দয়া করবেন। যে তার ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে, আল্লাহ তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন ।'১৮

দুই, সৃষ্টির সেবা ও তাদের উপকার বয়ে আনে এমন ভালো কর্ম ও উত্তম ব্যবহারের করণে মানুষ বিপদাপদ ও অপমৃত্যু থেকে রক্ষা পায়। তার আয়ু বৃদ্ধি হয়, দীর্ঘ দিন সে বেঁচে থাকে। রাসূল সা. বলেছেন :

صنائع المعروف تقي مصارع السوء. و صدقة السر تطفئ غضب الرب. و صلة الرحم تزيد في العمر

'মানব কল্যাণমূলক কর্ম বা আর্তমানবতার সেবা বিপদাপদ ও অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে, গোপন দান আল্লাহর ক্রোধ নির্বাপিত করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা আয়ু বৃদ্ধি করে।'১৯

তিন. চরিত্রের দ্বারা অন্যরা প্রভাবিত হয়। যিনি সুন্দর গুণের অধিকারী, উদার, মহৎ ও ক্ষমাশীল এবং সৎ ও পরিচ্ছন্ন হৃদয়, তার আখলাক ও ভালো দিকসমূহ মানুষকে প্রভাবিত করে। প্রচণ্ড আকর্ষণ করে। তার চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আদর্শ অন্যরা গ্রহণ করে। একজন মুসলিম যখন একজন অমুসলিমের সঙ্গে ভালো আচরণ করে, সুন্দর ব্যবহার করে, তখন বোধ করি অমুসলিমটি মুগ্ধ চিত্তে ইসলামে প্রবেশ করে। ইসলামী আদর্শ, দর্শন ও মূল্যবোধ অনায়াসে গ্রহণ করে। যুগে যুগে অসংখ্য মানুষ ইসলামে প্রবেশ করেছে শুধু মুসলিমদের চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে। এটা ঐতিহাসিক সত্য ও প্রমাণিত। চারিত্রিকগুণে ইসলাম মানুষের হৃদয় জয় করেছে। ইসলামের নবী মুহাম্মাদ সা.-এর উত্তম গুণাবলী এবং মহৎ মানবিক আচরণ ও চরিত্র দেখে অসংখ্য শত্রু ও হিংসুক তার পরম বন্ধুতে পরিণত হয়েছে, তার আদর্শ ও বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। যে মনেপ্রাণে তাকে ঘৃণা করতো, সেই তাকে প্রাণাধিক ভালোবাসতে শুরু করেছে।

ওমর ইবন খাত্তাব রা.। যিনি একসময় রাসূল সা.-কে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন, তিনিই ইসলাম গ্রহণ করে তার পদতলে নিজেকে সমর্পিত করলেন ও বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের থেকেও অধিক প্রিয়, আপনাকে আমি প্রাণাধিক ভালোবাসি।'২০

সুমামা ইবন উসাল নামে এক ব্যক্তি নজদ এলাকায় মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। তাকে মদিনায় আনার পর তিনি রাসূল সা.-এর আচরণে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূল সা. কে বললেন

يا محمد. والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك. فاصبح بلدك أحب البلاد إلي.

'হে মুহাম্মাদ, আল্লাহর কসম, ইতোপূর্বে আমার কাছে যমিনের বুকে আপনার চেহারা ছিল সবচেয়ে অপসন্দনীয়। কিন্তু এখন আপনার চেহারাই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আপনার ধর্ম ছিল আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত। এখন আপনার ধর্মই আমার কাছে অধিক সমাদৃত। আপনার শহর ছিল আমার কাছে সবচেয়ে খারাপ শহর। এখন এটিই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় শহর।'২১

হিন্দা বিনতে উতবা ইবন রবি'আ ওহুদের যুদ্ধে রাসূলের প্রিয় চাচা হামজা রা.-এর লাশ বিকৃত করে ছিলেন; তার চোখ, কান, নাক কেটে এবং বুক চিড়ে কলিজা বের করে লাশের সঙ্গে পৈশাচিক আচরণ করে ছিলেন। ইসলামের এই ঘোর শত্রু হিন্দা ইসলাম গ্রহণের পর একদিন রাসূল সা.-কে বললেন :

'হে আল্লাহর রাসূল, এক সময় ভূ-পৃষ্ঠে তাঁবুতে বসবাসকারীদের মধ্যে (তৎকলীন আরবের মানুষ সাধারণ তাঁবুতে বসবাস করত) আপনার অনুসারীরা লাঞ্ছিত হোক এটা আমার কাছে খুব প্রিয় ছিল। কিন্তু আজ আমার কাছে আপনার অনুসারীরা সম্মানিত হোক এটা সবচেয়ে বেশি প্রিয়।'২২

রাসূলের সেই চারিত্রিক শিক্ষাই ধারণ করে ও চর্চা করে প্রকৃত মুসলিমরা। সৎ, নিষ্ঠাবান ও হৃদয়বান মুসলিমের চরিত্র হিদায়াতের উৎস ও আলো, যে আলোয় অন্ধকার হৃদয় হয় আলোকিত।

কুরআন অধ্যয়ন করা

কুরআন তার পাঠকে'কে চরিত্র শেখায়, চরিত্র গঠনে উদ্বুদ্ধ করে। মহৎ গুণাবলী অর্জন ও সুন্দর সুন্দর বৈশিষ্ট্য অবলম্বনের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শের বিকল্প নেই। কেননা এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে মানবজাতির পথনির্দেশ ও জীবনবিধান হিসেবে। এটি মানুষের জন্যে শেফা, আরোগ্য, হিদায়াত ও রহমত। আল্লাহ বলেন :

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. يا أيها الناس قد جائتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين.

'আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত। হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার আরোগ্য এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।'২৩

মানুষের মধ্যে যে পাশবিকতা ও অমানবিকতাসুলভ কিছু কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য আছে, তা দূর করে সেখানে মানবিকতা, নৈতকতা, ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ ইত্যাদি সকল উত্তম গুণাবলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ জন্ম দেয়।

কুরআনের বহু আয়াতে চরিত্র পাধান্য পেয়েছে। ভালোর প্রশংসা ও তার প্রতি উৎসাহ এবং মন্দের সমালোচনা ও তার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে ওইসব আয়াতে। গভীর মনোযোগ সহকারে কুরআনের বাণী পাঠ করলে বা শোনলে, ও অর্থ বুঝে তা নিয়ে কল্পনা করলে ও ভাবলে; অন্তরে তা দাগ কাটে, এক অনাবিল অপার্থিব প্রশান্তি নেমে আসে ও শুভবোধ জন্ম নেয়। তখন ভালো কাজের প্রতি, সুন্দর আখলাকের প্রতি মন ধাবিত হয়, প্রলুব্ধ হয়। আল্লাহ বলেন 'নিশ্চয়ই এই কুরআন হিদায়াত করে সেই পথের দিকে, যা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মশীল বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার।'২৪

রাসূল সা. সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, তিনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত। এদিকে আম্মাজান আয়েশা রা.-কে রাসূলের মৃত্যুর পর তার আখলাক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, রাসূল সা.-এর আখলাক বা চরিত্র ছিলো আল কুরআন। অর্থাৎ কুরআনের আলোকে তিনি তার জীবন গড়েছিলেন। কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শ এবং নির্দেশ ও আবেদন ইত্যাদিসহ তাতে উল্লেখিত সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য রাসূল সা. নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেছিলেন। তাই তিনি হয়ে উঠেছিলেন কুরআনের বাস্তব নমুনা, তার জীবনচরিত রূপ নিয়েছিল হুবহু কুরআনে। কুরআনের চরিত্র ধারণ করে রাসূল সা তার চরিত্রকে এমনই শোভামণ্ডিত, পুষ্পিত ও কোমল-মধুর স্নিগ্ধতায় ভরে দিয়েছিলেন।

কুরআনের অনুপম বাণী চিরন্তনে মুগ্ধ হয়ে মানুষ কীভাবে উত্তম গুণাবলী অবলম্বনে প্রণোদনা পায়, তার কয়েকটি উদাহরণ দিই :

আবু বকর সিদ্দিক রা. তার অসহায়, দরিদ্র আত্মীয় মিসতাহ ইবন আসাসাহ'কে দান করতেন, আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। কিন্তু যখন তার কন্যা ও রাসূলের প্রিয়তম জীবনসঙ্গিনী, আম্মাজান আয়েশা রা.-এর বিরুদ্ধে মুনাফিকরা অপবাদ রটাল,

তখন এই সরলমনা সাহাবি মিসতাহও তাদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এরপর আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ করে আয়েশার পবিত্রতা ও নির্দোষতা ঘোষণা করলেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আবু বকর রা. মিসতাহ'কে সাহায্য করা বন্ধ করে দেন। তখন আয়াত অবতীর্ণ হলো

'তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবীদেরকে এবং আল্লাহর পথে যারা গৃহ ত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দেবে না; তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে ও তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে; তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

এই আয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গে আবু বকর রা. বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই, হে আমাদের রব! আমরা তো আপনার ক্ষমা-ই চাই। এরপর তিনি আগের সিদ্ধান্ত ত্যাগ করে মিসতাহ'কে আবার সাহায্য-সহযোগিতা করা শুরু করলেন। ২৫

উয়াইনা ইবন হিসন ইবন হুজায়ফা নামের এক ব্যক্তি একদিন খলিফা ওমর ইবন খাত্তাব রা.-এর কাছে এসে বলল, হে ওমর! আল্লাহর কসম, আপনি আমাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে অনুদানও দেন না এবং আমাদের মাঝে ন্যায়বিচারও করেন না। ওমর একথা শুনে প্রচণ্ড রেগে গেলেন ও তাকে কিছু একটা করতে উদ্যত হলেন। তখন পাশে অবস্থান করা হুর ইবন কায়স বললেন, আমিরুল মু'মিনীন! আল্লাহ তা'আলা তো তার নবী সা.-কে বলেছেন :

خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين

'আপনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করুন, সৎ কাজের আদেশ করুন ও অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলুন ।'

আর এই ব্যক্তি তো নিঃসন্দেহে অজ্ঞ। হুরের মুখে কুরআনের এই বাণী শোনার পর ওমর শান্ত হয়ে গেলেন, তার রাগ চলে গেল এবং ওই ব্যক্তিকে কিছুই করলেন না। ২৬

সাহাবি আবু তালহা রা.-এর বায়রুহা নামে একটি খেজুরের বাগান ছিল, মসজিদে নববী সংলগ্ন এই বাগানটি তার খুব লাভজনক ও প্রিয় সম্পদ ছিল। রাসূল সা. এই বাগানে প্রবেশ করে এর সুপেয় মিষ্টি জল পান করতেন। আবু তালহা রাসূলের কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ বলেছেন

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

'তোমরা যা ভালোবাস, তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না।'

বায়রুহা খেজুর বাগানটি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, তাই কল্যাণ লাভ করার আশায় আমি এই বাগানটি আল্লাহর নামে দান করলাম। আশা করি, আল্লাহর নিকট এর প্রতিদান আমার জন্যে সঞ্চয় হিসেবে থাকবে। আপনি যাকে ইচ্ছে তাকে এটি দিয়ে দিন। রাসূল সা. বললেন, তোমাকে ধন্যবাদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ, এ হচ্ছে লাভ জনক সম্পদ! তুমি যা বলেছ তা শুনলাম (ও গ্রহণ করলাম)। আমি মনে করি, তোমার আপনজনদের মাঝে এটি বণ্টন করে দাও। আবু তালহা বললেন, জি হ্যাঁ, আমি তাই করব। এরপর তিনি তার আত্মীয়-স্বজন ও চাচার বংশধরের মাঝে এই বাগান ভাগ করে তাদেরকে মালিক বানিয়ে দিলেন। ২৭

ফুজাইল ইবন ইয়াজ রহ. ইসলামী ইতিহাসে একজন বিজ্ঞ আলেম ও বুযুর্গ হিসেবে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তার প্রথম জীবনটা এমন ছিল না, এক সময় তিনি বেশ খারাপ ছিলে । দস্যু, ডাকাত দলের সরদার ছিলেন তিনি। এক নারীর প্রেমে পড়ে একবার তিনি দেয়াল টপকে প্রেমিকার কাছে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তার কানে ভেসে এলো কুরআনের মধুর বাণী, পাশের বাড়ীর কোনো ঘরে কে যেন তিলাওয়াত করছেন :

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله و ما نزل من الحق؟

'যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় ভক্ত-বিগলিত হবার সময় কি আসে নি, আল্লাহর স্মরণে ও যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে'?

কুরআনের এই উপদেশবাণী শোনার পর ফুজাইলের হৃদয় সত্যি-ই বিগলিত হলো, তিনি বললেন, হে আমার রব! হ্যাঁ, অবশ্যই সময় এসেছে। এরপর তিনি প্রেমিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সেখান থেকে ফিরে আসেন, ওই জীবন থেকেই সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে এক নতুন জীবন গ্রহণ করেন। ফুজাইল বিশুদ্ধ অন্তরে খাঁটি তওবা করেন ও পবিত্র মক্কায় আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী হয়ে ইবাদত করে করে সেখানেই বাকী জীবনটা অতিবাহিত করে দেন। ২৮

ইবরাহীম ইবন আদহাম রহ.কে নিয়েও এমন ঘটনা শোনা যায়। তিনি বুযুর্গ ও আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবে পরিচিত। জানা যায় প্রথম জীবনে তিনি বুযুর্গ ছিলেন না, ছিলেন সম্পূর্ণ পরকালবিমুখ, ধর্মকর্মহীন এক যুবক। বিত্তশালী বাবার আদরের সন্তান, উশৃংখল ও বিলাসী জীবনযাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। একদিন ইবরাহীম বনে শিকার করতে গেলেন, ঘোড়ায় আরোহণ করে শিকারের পেছনে পেছনে ছুটে চলেছেন। এমন সময় তিনি শুনলেন, কে যেন. তাকে সম্বোধন করে বলছে, হে ইবরাহীম! তুমি এই কী করছো? এটা তো অনর্থ কাজ।

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا و أنكم إلينا لا ترجعون.

'তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থ সৃষ্টি করেছিলাম এবং তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না?'

অতএব হে ইবরাহীম! আল্লাহকে ভয় কর এবং ওই দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো, যেদিন তুমি হয়ে যাবে শূন্য, বড় অভাবী।

কুরআনের এই আয়াত ও উপদেশ শোনার পর ইবরাহীম ইবন আদহাম ঘোড়া থেকে নেমে গেলেন ও দুনিয়া ত্যাগ করে আখেরাতমুখি হয়ে গেলেন। একটি আয়াতের মর্মবাণী ইবরাহীমের জীবন পাল্টে দিল, জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। ২৯

কুরআন হচ্ছে নূর বা আলো। এই আলোয় আলোকিত যে হৃদয়, তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় না, কলুষিত হয় না। এই আলোকিত হৃদয় থেকে যা উৎসারিত হয়, তা শুধুই ভালো ও সুন্দর, কল্যাণময় ও উপকারী।

খলিফা ওমর ইবন আব্দুল আজিজ রহ. তার সাম্রাজ্যের সকল প্রাদেশিক গভর্নর বা প্রশাসকদের কাছে এই মর্মে চিঠি লিখলেন, তোমরা যার যার প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে আহলে কুরআন বা কুরআনের জ্ঞান যাদের আছে, তাদেরকে নিয়োগ দাও। কিছুদিন পর প্রদেশের গভর্নর খলিফাকে চিঠি লিখে জানালেন, আমরা রাজ্যের বিভিন্ন পদে আহলে কুরআনদেরকে নিয়োগ দিয়েছি, কিন্তু তাদেরকে আমানতদার পাই নি, তারা খিয়ানত করেছে। খলিফা ওমর এর উত্তরে লিখলেন, তা সত্ত্বেও তোমরা আহলে কুরআন বা কুরআনের আলেমগণকেই দায়িত্ব প্রদান কর; কারণ তাদের মধ্যে কল্যাণ কম পাওয়া গেলেও, অন্যদের মধ্যে মোটেও পাওয়া যাবে না। ৩০

মৃত্যু ও পরকালকে অধিক স্মরণ করা

চরিত্র বদলানোর একটি বড় মাধ্যম, মৃত্যু ও পরকালকে অধিক স্মরণ করা। মৃত্যুর ভয়াবহ রূপ ও তার পরবর্তী জীবন, অন্ধকার কবরের আযাব, নিঃসঙ্গতা, হাশরের দিন বা শেষ বিচারের দিনের করুণ বিভীষিকাময় পরিস্থিতি, আমলনামা, দাঁড়িপাল্লা, জাহান্নামের ওপর স্থাপিত পুল অতিক্রম এবং সর্বশেষ জান্নাতের অসীম সুখ ও জাহান্নামের ভীষণ শাস্তি ইত্যাদির স্মরণ মু'মিনকে সত্যিকার অর্থেই একজন ভালো মানুষে পরিণত করে, তাকে গুণী, চরিত্রবান হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। একাকী নির্জন জায়জায় বসে এসব বিষয় নিয়ে ভাবলে, কল্পনা করলে, পাথরের মতো শক্ত হৃদয়ও মোমের মতো নরম হয়ে যায়। বরফের মতো গলতে শুরু করে, চোখে জল নেমে আসে। আল্লাহ বলেন

كل نفس ذائقة الموت. و إنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار و أدخل الجنة فقد فاز. و ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور

'সকল জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; এবং নিশ্চয়ই উত্থান দিবসে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে; অতএব যাকে অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে, সে-ই সফলকাম; আর পার্থিব জীবন প্রতারণার বস্তু ছাড়া কিছুই না।'৩১

মহান আল্লাহর সামনে একদিন দাঁড়াতে হবে ও তার কাছে জীবনের হিসাব দিতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে সকল কৃতকর্মের; জানা নেই কী ঘটবে ভাগ্যে, কী হবে শেষ পরিণতি- জান্নাত, না-কি জাহান্নাম, এই জাতীয় ভাবনা বা অনুভূতি বা স্মরণ মানুষের অন্তরে বড় ধরণের প্রভাব ফেলে, দাগ কাটে। তখন তার স্বভাব, অভ্যাস ও আখলাক সবকিছুতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, নিজের ভেতরে জন্ম নেয়া এক প্রকার অনুপ্রেরণা থেকে সে খারাপ ছেড়ে ভালো'র দিকে ঝুঁকে পড়ে। ধীরে ধীরে সৎ, ধার্মিক ও চরিত্রবান হয়ে উঠে।

বিবাহ

আখলাক ভালো করা ও ভালো রাখার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, বিবাহ। বিবাহিত জীবন বা দাম্পত্য জীবন, মানুষের সুস্থ সামাজিক প্রথা ও প্রাকৃতিগত বিষয়। ইসলাম এই প্রথা'কে মু'মিনের জন্যে বাধ্যতামূলক করেছে ও নারী-পুরুষের চরিত্র ভালো রাখার একটি মাধ্যম হিসেবে আকর্ষণবোধ ও প্রবৃত্তির অশ্লীল বাসনা, তা চমৎকারভাবে দমন করে। হাদিসের ভাষায় :

يا معشر الشباب. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر. و أحصن للفرج. و من لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء.

'হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ চোখকে অবনত রাখে ও লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন সাওম পালন করে; কেননা সাওম প্রবৃত্তিকে দমন করে।'৩২

একবার রাসূল সা.-এর দৃষ্টি পড়ল এক নারীর প্রতি, তখন তিনি তার স্ত্রী যাইনাব রা-এর কাছে এসে তার চাহিদা পূরণ করলেন। এরপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাহাবিগণকে বললেন, 'নারী শয়তানের রূপে আগমন করে ও গমন করে (অর্থাৎ নারী পুরুষের জন্যে ফেতনা, নারীর রূপ পুরুষকে আকর্ষণ করে ও খারাপ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে)। যখন তোমাদের কারো দৃষ্টি কোনো নারীর ওপর পড়ে (ও তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে), তখন সে যেন তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে তার চাহিদা পূরণ করে; এর ফলে তার মনোবাসনা পূর্ণ হয়ে যাবে।'৩৩

বিবাহ মানুষকে সাংসারি করে ও দায়িত্বশীল ও পরিশ্রমী বানায়। দাম্পত্য একটি নারী ও একটি পুরুষকে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনের দিকে পরিচালিত করে; উদাসীনতা, পাগলামি, নোংরামি ও নষ্টভ্রষ্টতা থেকে ফিরিয়ে এনে তাকে করে তোলে আদর্শ অভিভাবক ও গৃহকর্তা, কর্মজীবী ও স্বাভাবিক নৈতিকতাবোধসম্পন্ন মানুষ। চরিত্র গঠনে তাই বিবাহ একটি পরীক্ষিত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা।

তথ্য সূত্র :

১ সুনান আবি দাউদ : ৪৬৮২, আহমাদ : ২/৫২৭
২ হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/১৯১, আলবানী, সহীহুল জামি : ১/৯৭, সহীহুত তারগীব : ২/৩৫৯
৩ সহীহুল বুখারী, হাদিস নং ১০
৪ সূরা আ'রাফ, আয়াত, ১৭৯
৫ সহীহুল বুখারী, হাদিস নং ৬৩০৮
৬ সূরা শুরা, আয়াত, ১৮
৭ সূরা বাকারা, আয়াত, ১৮৬
৮ তাবরানী, ৮/২৭০, আলবানী, সহীহুল জামে, ১২৬৬
৯ তিরমিযী, ৩৫৯১, আলবানী, সহীহুল জামে, ১২৯৮
১০ সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৭২২
১১ সূরা আনকাবুত, আয়াত, ২৯
১২ ইবন আবিদ্ দুনয়া, আল হিলম, ২, আল তারীখ লিল খাতীব আল বাগদাদী, ৯/১২৭, আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন, দেখুন, আস্ সহীহা, হাদিস নং ৩৪২
১৩ সহীহুল বুখারী, হাদিস নং ৬১১৪, সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৬০৯, মুসনাদ আহমাদ, ২/২৩৯,৫১৭,
১৪ সূরা তাওবা, আয়াত, ১১৯
১৫ হাকেম, মুসতাদরাক, ৭৩১৯, আহমাদ, মুসনাদ, ৮০১৫
১৬ আবুদাউদ, সুনান, ৪৮৩১, হাকেম, মুসতাদরাক, ২৮০
১৭ সহীহুল বুখারী, হাদিস নং ২১০১,৫৫৩৪, সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৬২৮
১৮ সহীহুল বুখারী, হাদিস নং ২৪৪২, সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৮০, আবুদাউদ, সুনান, ২/২৩৫, তিরমিযী, সুনান, ২/১৪
১৯ হাইসামী, মাজমাউজ জাওয়াইদ, ৩/১১৫
২০ সহীহুল বুখারী, হাদিস নং ৬৬৩২
২১ সহিহুল বুখারি : হাদিস নং ৪৩৭২
২২ সহিহুল বুখারি : হাদিস নং ৬৬৪১
২৩ সূরা ইসরা, আয়াত, ৮২
২৪ সূরা ইসরা, আয়াত, ৯
২৫ তাফসীর ইবন কাসীর, সূরা নূর, আয়াত, ২২
২৬ সহিহুল বুখারি : হাদিস নং ৪৬৪২
২৭ সহিহুল বুখারি : হাদিস নং ৪৫৫৪
২৮ তারীখুল ইসলাম, ১২/৩৩৪
২৯ যাহাবী, সিয়ার আলাম আল নুবালা, ৭/৩৮৮
৩০ ইবন মুফলিহ আল মাকদিসী, আল আদাব আল শরইয়া, ২/৩১৬
৩১ সূরা আল ইমরান, আয়াত, ১৮৫
৩২ সহিহুল বুখারি : হাদিস নং ৫০৬৫, ১৯০৫
৩৩ সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১৪০৩

লেখক : গবেষক ও কাতার প্রবাসী
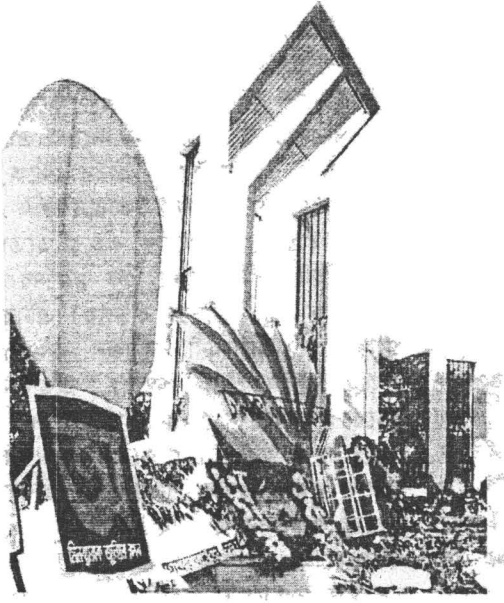
আমাদের দুখিনী বাংলা ভাষা

আবদুস সাত্তার আইনী

১.

আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা কির না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স এবং নিজের বাকচাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হয়ে উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঙালি জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি চোখ ঠাওরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসব কথা লিখেছিলেন ১১৮ বছর আগে, এখনও কেউ বাঙালির চারিত্রিক লক্ষণগুলোর দিকে তাকিয়ে এসব কথা বলতে পারবে। তাদের চরিত্রে পরিবর্তন তেমন ঘটে নি। পরিবর্তন যা ঘটেছে তা হলো, ভিনদেশি সংস্কৃতির আত্তীকরণ এবং ভাষার ভেতরে জীবাণু ঢুকিয়ে দেওয়া। কেবল প্রয়োজনের খাতিরে নয়, নিজেকে অভিজাত শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করার জন্য এবং জাত্যভিমান ও উচ্চমন্যতা-বোধ বাড়ানোর জন্য বিদেশি সংস্কৃতিকে লালন করা এবং বাংলা ভাষার ভেতরে বিদেশি শব্দ ঢুকিয়ে দেওয়া এখন একটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণি যে-বাংলায় কথা বলেন তা রুগ্‌ণ ও ব্যাধিগ্রস্ত বাংলা এবং তাঁদের কথা বলার যে-টোন বা স্বরভঙ্গি তাতে ইংরেজি উচ্চারণের লয় ও তাল বিদ্যমান। তাঁরা সম্ভাষণে 'হাই হ্যালো' বলেন এবং বিদায়ে বলেন 'টা টা বাই বাই'। 'বাট' ও 'সো' খুব বেশি বলেন এবং কথার অর্ধেকই বলেন ইংরেজি শব্দে। এঁরা ইংরেজি ভালো জানেন না, বাংলাও জানেন না। নিম্নবিত্ত শ্রেণি যে-বাংলায় কথা বলেন তা আঞ্চলিক বাংলা এবং বিশ্বায়নের প্রভাবে তাতেও ঢুকেছে জীবাণু। আলেমসমাজ যে-ভাষায় কথা বলেন তাতে আরবি-উর্দু শব্দের ব্যবহার অনেক বেশি এবং কোনো কোনো আলেম লেখক তাঁদের লেখায় এতো বেশি অপ্রচলিত আরবি-উর্দু শব্দ ব্যবহার করেন যে তা সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণি তো বুঝবেই না, মাদরাসায় পড়ুয়াদেরও বুঝতে হলে বিশেষ মেধার প্রয়োজন হবে। একটি উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র (জানুয়ারি ২০১৩) থেকে কিছু উদাহরণ দিচ্ছি দাম্পত্যজীবন, অজ্ঞতা ও পরিণামচারটি সংস্কৃত শব্দের শিরোনামের আলোচনায় আছে 'খাছ মজলিস', 'মুসাজ্জিলা', 'বে-চারা', 'হামদরদি', 'যিম্মাদার আলেমে দ্বীন', 'ছোহবত', 'হাকীকত', 'জযবা', 'খোলাসা', 'বে-হদ', 'কলমবন্দ', 'ইযদিওয়াজী যিন্দেগী', 'নস্‌লে ইনসানি'র মতো শব্দ। উল্লিখিত শব্দগুলোর দু'তিনটি হয়তো সব পাঠকের কাছে পরিচিত, বাকিগুলো অপরিচিত। 'ইযদিওয়াজী যিন্দেগী' ও 'নস্‌লে ইনসানি' শব্দদুটি অবশ্য অর্থসহ আছে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, সাড়ে আঠারো কলামের এই লেখায় উল্লিখিত শেষ শব্দটি আছে নবম কলামে আর বাকি শব্দগুলো আছে প্রথম তিনটি কলামে। স্পষ্ট যে, লেখক যতোই আলোচনার গভীরতায় প্রবেশ করেছেন ততোই আরবি-উর্দু শব্দের ব্যবহার থেকে দূরে সরে গেছেন। এর মানে হলো, আলোচনার শুরুতেই এতোগুলো অপরিচিত আরবি-উর্দু শব্দের ব্যবহার স্বতঃস্ফূর্ত নয়, বরং আরোপিত। এই মুখপত্রের একই সংখ্যায় 'শিক্ষার্থীদের পাতা'র (তালিবে ইলমের পাতা নয় কিন্তু!) 'শিক্ষা পরামর্শে' (তালিমি মুশাওয়ারা নয়) উত্তরদাতার বক্তব্যে আমরা পাই 'তালীমী প্রশ্ন' (পাশাপাশি আরবি ও সংস্কৃত শব্দ; তালিমি সুওয়াল কেনো লেখা হলো না?), 'জাযাকাল্লাহু খায়রান', 'আহলে ইলম ও আহলে কলম', 'এ সকল হযরত', 'আহলে দিল', 'মুখলিস', 'আসাতিযা ও আকাবিরের ইসলাহী বয়ান', 'বয়োঃবৃদ্ধ বুযুর্গদের মালফূযাত' (এবার সংস্কৃত ও ফারসি ও আরবি একসঙ্গে), 'এসব বিষয় ইস্তিকবাল করব', 'জাযাউল আমাল', 'রিসালা', 'খুতুবাত ও মাজালিস মুতালাআ করুন'-এর মতো অপরিচিত শব্দ ও অদ্ভুত শব্দবিন্যাস। এটা যদি শিক্ষার্থীদের পাতা হয়ে থাকে তাহলে এসব শব্দের ব্যবহার পণ্ডশ্রম হয়েছে। আর যদি তালিবে ইলমের পাতা হয়ে থাকে তাহলে আরবিতে লেখাই ভালো ছিলো। এসব লেখা পড়লে মনে হয়, তাঁরা আরবি আর উর্দুতেই লিখতেন, বাঙালি জাতির প্রতি করুণা করে লিখছেন বাংলায়।

ভাষা দুষণও মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। ঢাকা শহরে যদি ভাষা-দুষণের ওপর একটা জরিপ হলে বুঝা যেতো এ-দুষণ কী পরিমাণ বেড়েছে। দোকানপাটের সাইনবোর্ডে, পোস্টার-ব্যানার-লিফলেটে, নিষেধাজ্ঞা ও অনুমোদনফলকে এতোবেশি

ভুল চোখে পড়ে যে চোখ তাতে পীড়নবোধ করে। নিশ্চয় এটা প্রকাশ্যে ভাষার শ্লীলতাহানির নামান্তর। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক 'বসা নিষিদ্ধ' বা 'প্রবেশ নিষিদ্ধ'র জায়গায় 'বসা নিষেধ' বা 'প্রবেশ নিষেধ' 'যুদ্ধাপরাধী'র জায়গায় 'যুদ্ধাঅপরাধী', 'সরণি' বা 'সরণী'র জায়গায় 'স্বরণী' বা 'স্মরণী', 'স্টেশন', 'স্টপিজ', 'রেস্টুরেন্ট', 'ফাস্ট ফুড', 'স্টাফ', 'মডার্ন', 'কর্নার', 'পেস্ট্রি' এবং 'ডায়াগনোস্টিক'-এর জায়গায় 'ষ্টেশন', 'ষ্টপিজ', 'রেষ্টুরেন্ট', 'ফাষ্ট ফুড', 'ষ্টাফ', 'মডার্ণ', 'কর্ণার', 'পেষ্ট্রী', 'ডায়াগণোষ্টিক' যত্রতত্র আমাদের চোখে পড়ে। সাইনবোর্ড-ব্যানার-পোস্টারে এখন শুধু বাংলা লেখা হয় না, ইংরেজিও লেখা হয় এবং লেখা হয় বাংলিশ।

এফএম রেডিও ও টিভি চ্যানেলগুলোও ভুল বাংলার প্রচার করে এবং ভুল বাংলার প্রচার-প্রসারকে তারা গুরুদায়িত্ব মনে করে। আঞ্চলিক ও প্রমিত বাংলার সমন্বয়, বাংলিশ ভাষায় উপস্থাপনা, ভুল উচ্চারণ, শব্দের ভুল ব্যবহার তাদের কাছে একটা পূজনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে যুক্তি দেখানযেমন আনিসুল হকটিভিতে তাঁরা সেই ভাষাই ব্যবহার করতে চান যা ঢাকার তরুণতরুণীরা প্রতিদিন বলছে। নাটকের সংলাপে সে-ভাষাই ব্যবহার করা ভালো যা বাস্তব চরিত্রের মানুষটি ব্যবহার করে। কিন্তু এতে ফল হচ্ছে উল্টো। যেসব তরুণতরুণীরা বাংলিশ বা আধা আঞ্চলিক ও আধা প্রমিত ভাষায় কথা বলে তারা টিভি চ্যানেলগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। এভাবে একটা অচ্ছেদ্যচক্রের মতো উভয় উভয়কে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় প্রভাবিত করতে। এতে প্রামাণ্য ভাষার কোনো উন্নতি ঘটছে না; বরং শিক্ষিত মানুষের মুখ থেকে প্রমিত ও শুদ্ধ ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে।

২.

আমাদের চরিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বাড়িতে বসে অসার অহঙ্কার করা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নিয়ে আমাদের যে-অহঙ্কার তাও অসার অহঙ্কারেরই নামান্তর। কারণ এই দিবসের সঙ্গে বাংলা ভাষার কোনো সম্পর্ক নেই। জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা-সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে সত্য সত্যই বাংলা ভাষায় কোনো মহিমা যোগ করে নি। এ-দিবসের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ কেবল একটা তারিখ একুশে ফেব্রুয়ারি। পূর্ব বাংলায় এই দিনে মাতৃভাষার দাবিতে একটা রক্তক্ষয়ী আন্দোলন হয়েছিলো, সেই ঘটনার প্রতি স্বীকৃতি জানিয়েই ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করেছে। বাংলা সঙ্গে তার যোগাযোগ বলতে গেলে এতোটুকুই।

পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ভাষায় মানুষ কথা বলে। এর মধ্যে প্রায় তিন হাজার ভাষাই প্রধান প্রধান ভাষার প্রভাব ও চাপে হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম করেছেন। ইউনেস্কো দুর্বল ভাষাগুলোগে বাঁচাবার লক্ষ সামনে নিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই দিবসে পৃথিবীর মানুষ মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন এবং মাতৃভাষা যে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ তা উপলব্ধি করবেন। তারিখ হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে বেছে নেওয়ার পেছনে আছে কানাডায় প্রবাসী দুই বাঙালি ছাত্র রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালামের অবদান।

২০০০ সাল থেকে ইউনেস্কো এই দিবসটি উদ্‌যাপন করে আসছে। এই উপলক্ষে প্রতিবছর একটি করে পোস্টার প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে একটি বাণীও প্রদান করা হয়। ২০০২ সালের পোস্টারটি ছিলো ভাষার বৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করে; এই পোস্টারে বিভিন্ন ভাষার বর্ণ ছিলো; কিন্তু তাতে বাংলা বর্ণমালার কোনো হরফ ছিলো না। ইউনেস্কোর মহাপরিচালক প্রতিবছর যে-বাণী প্রদান করেন, তা প্রকাশ করেন ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, চীনা, রুশ এবং আরবি ভাষায়। কিন্তু পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা বাংলায় একবারও এই বাণী প্রকাশ করা হয় নি। এ থেকে সহজেই বোধগম্য হয় যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক কতোটা ক্ষীণ। খোদ বাংলাদেশেও এ-দিবসটির প্রতি সত্যিকার অর্থে যথার্থ সম্মান দেওয়া হয় না। এ-দিনটি পালনের পেছনে যে-মহান উদ্দেশ্য ছিলো তার প্রতিও শ্রদ্ধা দেখানো হয় না। বরং দিন দিন শ্রদ্ধাবোধ কমে যাচ্ছে বলে মনে হয়।

৩.

বিশ্বায়নের অনেকগুলো নেতিবাচক প্রভাবের মধ্যে একটি হলো ধনাঢ্য ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের পাশাপাশি তাদের ভাষার সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার। মুসলমাদের ধর্মীয় ভাষা আরবি যেমন ভাষিক সাম্রাজ্যবাদের থাবা থেকে রেহাই পায় নি তেমনি বাংলা ভাষাও রেহাই পাচ্ছে না ইংরেজি ভাষার থাবা থেকে। শুধু কম্পিউটারই বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে প্রায় বত্রিশটি ইংরেজি শব্দ নিয়ে। এই কম্পিউটার যদি আসতো আরব থেকে, আমরা পেতাম বত্রিশটি আরবি শব্দ। কাউকে কষ্ট করে আরোপ করতে হতো না। মোবাইল ফোনসেটও এক ডজনেরও বেশি শব্দ নিয়ে এসেছে বাংলায়। এটার বাংলা 'মুঠোআলাপনী' কয়জন বাঙালি ব্যবহার করেন তাঁদের কথায়? প্রতিদিন ইউরোপ-আমেরিকা থেকে আমাদের দেশে অজস্র পণ্য আসছে। সেগুলো আমাদের বাজার দখল করার পাশাপাশি ছোবল বসাচ্ছে আমাদের মাতৃভাষা বাংলার গায়ে। অপ্রতিরোধ্য ভাষিক আগ্রাসন থেকে বাংলাকে বাঁচানোর কোনো পথ নেই। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের কারণেও আমাদেরকে বাংলার সঙ্গে ইংরেজি শব্দ ও শব্দসমষ্টি ব্যবহার করতে হচ্ছে। বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তিতে এসব শব্দ বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের প্রতিদিনের মুখের কথায়ও অহরহ ব্যবহৃত হচ্ছে এসব ইংরেজি শব্দ। কারণ আমরা বাংলা বাক্যে ভিনদেশি এই শব্দগুলো জুড়ে না দিয়ে মনের ভাব সম্পন্ন করতে পারছি না। আমরা ঘরে-বাইরে চারপাশে তাকালে যেমন ইউরোপ-আমেরিকান পণ্য বা তাদের উদ্ভাবিত সামগ্রী দেখতে পাই এবং এগুলো ছাড়া আমাদের চলেও না, তেমনি দেখতে পাই নতুন নতুন ইংরেজি শব্দের বিস্তার, এগুলো ছাড়াও আমাদের চলে না। তারপরও যতোদূর সম্ভব, আমরা লেখায় ও কথায় এসব শব্দ ব্যবহার করবো না। যেসব ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বা পরিভাষা আছে, সেগুলো ইংরেজিতে ব্যবহার না করে বাংলাতেই করা উচিত।

ভারত আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বলে তাদের প্রধান ভাষা হিন্দির প্রভাবও বাংলার ওপর পড়ছে। এই প্রভাব যতোটা না পড়ছে বাংলা ভাষার ওপর তার চেয়ে বেশি পড়ছে বাঙালির চেতনার ওপর। হিন্দি চ্যানেল এবং হিন্দি সিনেমা ও সিরিয়াল ছাড়া যেসব বাঙালির ভালো লাগে না তাঁরাই এর জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী। শিশু-কিশোররা প্রভাবিত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। ডোরেমন নামের যে-হিন্দি কার্টুন প্রচার করা হয় ভারত থেকে, বাংলাদেশের শহুরে শিশুদের কাছে এটা অমৃতের মতো। এই কার্টুনের বাংলা অনুবাদও পাওয়া যায় একুশে বইমেলায়। শিশুকিশোরদের ওপর হিন্দি চ্যানেলগুলোর প্রভাব যে কী ভয়াবহ

তার একটা বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যায়। আমি রাজধানীর একটি দামি স্কুলে সপ্তম শ্রেণি ও পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া দুই ভাইকে পড়াতাম। এরা ঝগড়া লাগলেই হিন্দিতে কথা বলতো। যেমন বড়োটা ছোটোটাকে বললো, ওয়েল ইউর ওঅন মেশিন। ছোটোটা বললো, আপকা মাথে মে খোদ পানি ঢাল। বড়োটা বললো, আপকা মাথা তোড় দোউঙ্গা। ছোটোটা বললো, আপকা জিগর ফাড় দোউঙ্গা। শুরু হয়ে গেলো ঝগড়া এবং চললো হিন্দিতে। অথচ এরা পরপর দুটি বাক্য শুদ্ধ বাংলায় বলতে পারতো না, লিখতে তো নয়ই। এদেরকে আমি শিশুতোষ পত্রিকা দিয়েছিলাম। বিছানার নিচে রেখে দিয়ে একমাস পর ফেরত দিয়েছে।

এসব ব্যাপারে শিক্ষক ও অভিভাবককে যেমন সচেতন ও সতর্ক হতে হবে, তেমনি যাঁরা হিন্দি সিনেমা ও সিরিয়াল প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন তাঁদের ভালোবাসা কমাতে হবে।

৪.

বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ নেই। মাদরাসায় তো নয়ই, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়েও নয়। যাঁরা চিকিৎসা ও প্রকৌশলবিদ্যা অর্জন করেন তাঁরা পাঠ্য হিসেবে কখনো বাংলা বই পড়েন না। বিজ্ঞান বিভাগে যাঁরা পড়েন তাঁরা কিছু বই পান দুর্বল বাংলায় লেখা। বাণিজ্য বিভাগের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদেও বাংলা আছে অকিঞ্চিৎকর। যাঁরা বাংলা নিয়ে পড়েন তাঁরাই কেবল বাংলা মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন।

১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই বলে যে-আন্দোলন হয়েছিলো পূর্ব বাংলায় সেই বাংলা ভাষার ব্যবহার নেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রে। রাষ্ট্রযন্ত্রের অবকাঠামোগুলো পরিচালিত হয় ইংরেজি ভাষায়। প্রশাসনে বাংলার ঠাঁই নেই। বিচার বিভাগও ইংরেজি ছাড়া অচল, যদিও বিচার বিভাগ সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে সর্বত্র চালু করতে হবে বাংলা ভাষা। এটা একধরনের কপটতা, যা বাঙালির বৈশিষ্ট্য।

পরীক্ষার খাতায় বাংলায় লিখলে ভালো নাম্বার পাওয়া যায় না এবং ইংরেজি না জানলে ভালো চাকরি জোটে না। বাংলাদেশে ভালো চাকরি পেতে হলে অবশ্যই ইংরেজি জানতে হবে এবং বাংলা না জানলেও চলবে। বাংলা কেবল তাঁকেই জানতে যিনি শিক্ষকতা করবেন বাংলায়। অর্থাৎ উঁচু সারিতে এবং যাকে-বলে অভিজাত শ্রেণিতে পৌছতে হলে আপনাকে ইংরেজি শিখতেই হবে। আপনি বাংলা জানেন কি জানেন না সেটা কোনো ব্যাপার না। আপনি যখন অভিজাত শ্রেণিতে পৌছে যাবেন, আপনি ভালোবাসবেন ভিনদেশি ভাষাকে এবং অবজ্ঞার চোখে দেখতে শুরু করবেন মাতৃভাষা বাংলাকে। আপনি তাঁদেরকেও অবজ্ঞার চোখে দেখবেন যাঁরা ইংরেজি জানেন না এবং কথা বলেন শুধু বাংলায়। এভাবে যাকে-বলে অভিজাত শ্রেণি অবজ্ঞা অব্যহত রাখেন বাংলার প্রতি। ইংরেজি ছিলো শোষণের হাতিয়ার এবং দুর্বল শ্রেণির প্রতি অবজ্ঞা পোষণের খড়্গ এবং এখনো তাই আছে।

৫.

কওমি মাদরাসায় বাংলা ভাষার চর্চা শুরু হয়েছে এটা ভালো দিক। কিন্তু সত্যি বলতে, তাঁরা এখনো বাংলাকে যথার্থ ভালোবাসেন নি। অবশ্য এর জন্য সময় লাগবে। কিছুকাল আগেও কওমি মাদরাসায় বাংলা নিষিদ্ধ ছিলো; এখন নিষিদ্ধ না হলেও সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে যেতে সময়ের প্রয়োজন আছে। এখানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলা চর্চার সুযোগ নেই। যা আছে তা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। যিনি বাংলা শিখতে চান এবং বাংলা ভাষা চর্চা করতে চান, তাঁকে ব্যক্তিগতভাবেই তা করতে হয়। কিন্তু অবিকশিত চেতনার ফলে এবং সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগ বিফল হতে পারে। প্রতিটি ভাষার কিছু মৌলিক বিষয় আছে, যেমন আছে প্রতিটি ভাষার মৌলিক সাহিত্য। ভাষার রূপ-রস-গন্ধ এবং স্বাদ ও সৌন্দর্য আস্বাদন ও উপভোগ করতে হলে মৌলিক বিষয় ও মৌলিক সাহিত্য পাঠ ও চর্চার বিকল্প নেই। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে ভাষা ও সাহিত্য চর্চা গুরুমুখী বিদ্যা। গুরু ছাড়া এ-পথে এগিয়ে যাওয়া মুশকিল। তবে অসম্ভব নয়। কিন্তু গুরুর হাত ধরে একমাসে যতোদূর এগোনো যাবে, গুরু ছাড়া সে-পথ পাড়ি দিতে হবে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় ও শ্রমের বিনিময়ে। অন্যান্য বিষয়ের গুরুর কথা জানি না; ভাষা ও সাহিত্যের গুরুকে হতে হয় উদার এবং নতুনের অভিসারী। চিন্তায় ও বিশ্বাসে এবং চেতনায় ও উপলব্ধিতে শিষ্য তাঁর কাছাকাছি হতে পারে, হতে পারে কিছুটা বা অনেকটা দূরবর্তী; কিন্তু এজন্য শিষ্যকে তাড়িয়ে দেওয়া সঙ্গত হবে না। পরাজয় সবসময়ই দুঃসহ ও বেদনাদায়ক; কিন্তু দুই শ্রেণির মানুষ থেকে পরাজয় মেনে নেওয়া কাম্য ও সুখকর—পুত্র ও শিষ্য।

abdussattaraini@gmil.com

বিশ্বজুড়ে জাগছে মুসলমান জাগতে হবে আমাদেরও

মাওলানা শিব্বীর আহমদ
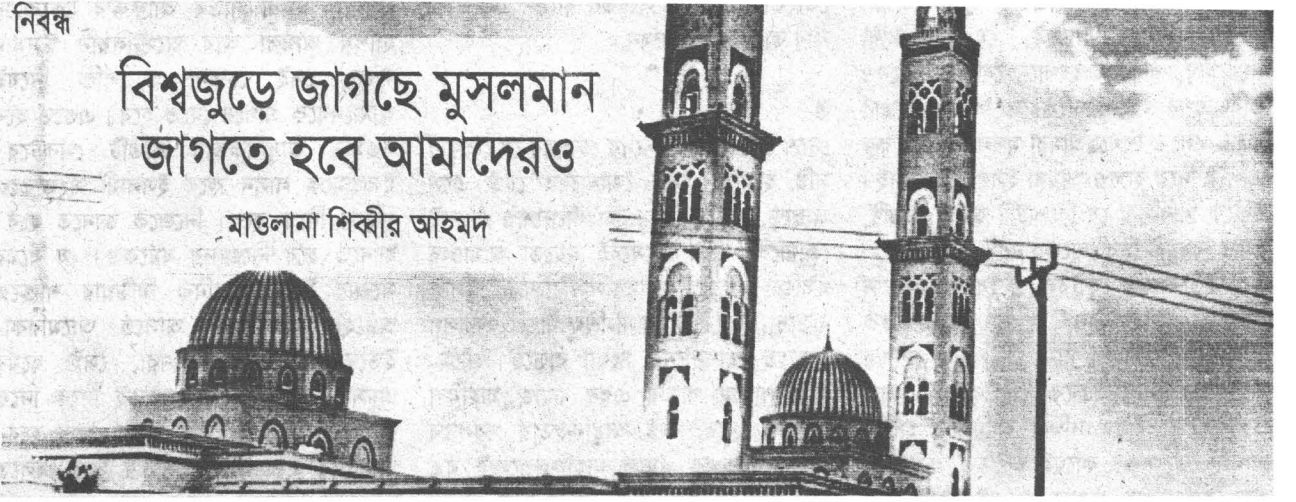
'বিশ বছর আগে যখন ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগ ফুটবল চালু হয়েছিল তখন পুরো লীগে একজন মুসলিম ফুটবলার ছিলেন, নাইম নামে টটেনহ্যামের একজন মিডফিল্ডার। গত মৌসুমে প্রিমিয়ারশীপে মুসলিম ফুটবলারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চল্লিশে। তাদের অনেকেই প্রিমিয়ার লীগের সুপার স্টার। যেমন চেলসির ডেমবা বা, ম্যানচেষ্টার সিটির ইয়াইয়া তোরে, সামির নাসরি, এভার্টনের মারওয়ার ফেলাইনি বা আর্সেনালের আবু দিয়াবি। আর এসব মুসলিম ফুটবলারের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে ইংলিশ ফুটবলে।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগ ফুটবলের অন্যতম তারকা, চেলসির ফরোয়ার্ড ডেমবা বা গোল করলেই প্রথমে মাঠে সেজদা দেন। ধর্মপ্রাণ এই মুসলিম খোলাখুলি বলেন, ফুটবলের চেয়ে তার ধর্ম তার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইংলিশ ফুটবল ফ্যানরা জানেন তাদের অনেক প্রিয় ফুটবলার মুসলিম এবং তারা নামাজ রোজা করেন। ক্লাবগুলোও এই বাস্তবতার সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। লিভারপুলের টিম ডক্টর জাফর ইকবাল, যিনি একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম, বিবিসিকে জানান ক্লাবের ক্যান্টিনে এখন সব মুরগির মাংস হালাল। অমুসলিমরাও তা মেনে নিচ্ছেন।

তারপরও রোজার মত কিছু ব্যাপারে, বিশেষ করে ম্যাচের সময় বা আগে ফুটবলারদের রোজা রাখা নিয়ে ম্যানেজার-কোচদের আপত্তি ও উদ্বেগ রয়েছে।

আর্সেনালের আবু দিয়াবি বিবিসিকে বলেন, 'আর্সেনাল চায় না আমি রোজা রাখি, কিন্তু তারা বুঝতে পারে, রমজান আমার কাছে একটা বিশেষ মুহূর্ত। আমার ইচ্ছার সাথে তারা খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে।'

চেলসির ডেমবা বাও স্বীকার করলেন, রোজা রাখা নিয়ে ম্যানেজারদের সাথে একটা টানাপোড়েন চলেই। 'যখনই ম্যানেজাররা রোজা রাখা নিয়ে আপত্তি তোলেন, আমি তাদের সরাসরি বলি, দেখ আমি রোজা রাখবো। তারপরও যদি আমার পারফরমেন্স ভালো হয়, আমাকে খেলতে দিও। যদি মনে করা ভালো হচ্ছে না, বেঞ্চে বসিয়ে রেখ।'

ডেমবা বা গত মৌসুমে নিউ ক্যাসেল ছেড়ে চেলসিতে গেছেন। তবে নিউ ক্যাসেলের পার্কের ফুটবলে অনেক বাচ্চা গোল করার পর তার মতো করে হাঁটু গেড়ে মাঠে মাথা ঠেকায়। হয়তো বা না বুঝেই। বোঝা যায়, মুসলমানদের ধর্মীয় আচার, সংস্কৃতি ইংলিশ ফুটবলে জায়গা করে নিচ্ছে।'

প্রতিবেদনটি বিবিসির। প্রচারিত হয় গত ২০.০৭. ২০১৩ তারিখে সাপ্তাহিক মাঠে-ময়দানে অনুষ্ঠানে।

২.

৯/১১এর ঘটনার পর গায়ের জোরে আমেরিকা আফগানিস্তানে হামলে পড়ে। পুরো বিশ্ববিবেককে উপেক্ষা করে হামলা চালায় ইরাকেও। দু'টি স্বাধীন দেশের স্বাধীনতাকে পিষ্ট করে দেয়। ইহুদী-খৃস্টান শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন মিডিয়াজগৎটাও তখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক অঘোষিত যুদ্ধে নেমে পড়ে। ইসলাম ও ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের টার্গেটে পরিণত হন। মুসলমানদেরকে তারা উগ্র জঙ্গী সন্ত্রাসী ইত্যাদি নানা নেতিবাচক বিশেষণে চিহ্নিত করে অবিরাম প্রচার চালায়। যেন শান্তির ধর্ম ইসলাম একটা সন্ত্রাসী ধর্ম। শান্তিরদূত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সন্ত্রাসী নেতা!! নিজেদের শক্তি ক্ষমতা ও সামর্থকে তারা পুরোপুরি কাজে লাগায় ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই প্রচারণায়।

কিন্তু সেই শক্তি ক্ষমতা ও প্রচারণার মোকাবেলা করার মতো সামর্থ কোথায় মুসলমানদের!? ফলে দুর্বল এই মুসলমানদেরকে মহান প্রভুর দরবারে সাহায্য চেয়ে চোখের পানি ফেলা ছাড়া আর কোনো পথ খুঁজে পায় নি। সেই চোখের পানি হয়তো বৃথা যায় নি। তাই তো দেখা যায় ইসলাম ও মুসলমানদেরকে কলঙ্কিত করে উপস্থাপনের যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও খোদ আমেরিকা ও ইউরোপেই ইসলামের জোয়ার সৃষ্টি হলো। সেখানকার খৃস্টানরা দলে দলে ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে লাগল। যে মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে ইউরোপ-আমেরিকা মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট ছিল, সেই মিডিয়ার কল্যাণেই সেই উন্নত বিশ্বের আধুনিক যুবক-তরুণেরা ইসলামকে জানার সুযোগ পেল। অনুসন্ধিৎসার বশেই তারা ইসলাম মুসলমান ও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানতে এগিয়ে এল। এ জানার ভেতর দিয়েই যেন তারা শান্তিময় জীবনের নতুন আহ্বান শুনতে পায়। সেই আহ্বানে সাড়া দিতেই এখন 'আশংকাজনক'ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই দুনিয়ায় ইসলামগ্রহণের হার।

এখানেই শেষ নয়, গায়ের জোরে এবং মিডিয়ার মাধ্যমে মুসলমান জাতি যখন হামলার শিকার হলো, তখন মুসলমান যুবকদের চেতনা নতুন করে জেগে উঠল। মুসলমানদেরকে স্তব্ধ করে দিয়ে নিজেদের গোলাম বানিয়ে রাখার যে মিশন নিয়ে অভিযানে নেমেছিল আমেরিকা ও তার দোসররা, তা বুমেরাং হয়ে উল্টো তাদের নিজেদের গলার কাটা হয়ে দাঁড়াল। সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে ইরাক-আফগানে বর্ণনাতীত ধ্বংসযজ্ঞে তারা মেতে উঠেছিল এ কথা ঠিক, তবে তাদেরও যে কী পরিমাণ সৈন্য ও অর্থ হারাতে হয়েছে তা এখনো অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে। উন্নত মিডিয়া হয়তো একসময় বের করে আনবে সেই হিসাব। তবে এখনই যে ফল দেখা যাচ্ছে তা হলো পৃথিবীর দেশে দেশে মুসলমানদের ঘুম ভেঙে গেছে। তারা যেন নতুন উদ্যম ও চেতনা ফিরে পেয়েছে। এই

জাগরণ পৃথিবীর সর্বত্রই। মুসলিমপ্রধান দেশগুলো তো আছেই, যেখানে তারা সংখ্যালঘু, পরিবেশ যেখানে বৈরি, সেখানেও তারা এখন মাথা উঁচু করতে শিখছে। জোর গলায় বলতে শিখছেআমরা মুসলমান, সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে হলেও আমরা ইসলামকেই চাই। শুরুতে বিবিসি'র যে রিপোর্টটি উদ্ধৃত করেছি, তাতে বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

শুধু ইউরোপের ফুটবল ক্লাবের মুসলমান খেলোয়াড়গণই নন, বরং আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে সাড়া জাগানো অমুসলিম দেশের কয়েকজন মুসলিম ক্রিকেটারের কথাও এখানে উল্লেখ করা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার হাশিম আমলা তো সবার কাছেই পরিচিত। চমৎকার লম্বা শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারা নিয়েই তিনি ঘুরে বেড়ান একটি অমুসলমান প্রধান টিমের সাথে। পুরো টিম যেখানে একটি বিয়ার কোম্পানির লোগো সম্বলিত জার্সি গায়ে চড়িয়ে মাঠে নামে, সেখানে তার জার্সি থাকে সেই লোগোমুক্ত। কোনো এলকোহলিক কোম্পানির প্রাইজমানিও তিনি গ্রহণ করেন না। তার অনুসারী অস্ট্রেলিয়ার নতুন এক ক্রিকেটারউসমান খাজা। অনলাইন সংবাদমাধ্যমের ভাষ্যখাজাও বিয়ারের লোগো সম্বলিত জার্সি গায়ে চাপাতে চান না! [সূত্রঃ নতুন বার্তা,২২/১০/২০১৩ ০৮:৪১:১২ রাত]

এগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং জেগে ওঠা মুসলমানদের ধারাবাহিক চিত্র। বিবিসি তো তাই বলেছে। সচেতন ব্যক্তিমাত্রই আশা করি তা স্বীকার করবেন।

৩.

দেশে দেশে মুসলমানদের চেতনার যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে, সেই জোয়ারের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে প্রিয় বাংলাদেশেও। সেই জোয়ারের অংশ হিসেবেই হয়তো আমাদের মসজিদ বাড়ছে, মাদরাসা বাড়ছে, মুসল্লি বাড়ছে, বাড়ছে মাদরাসা-শিক্ষার্থীও। তাবলিগ জামাতে যোগদানের সংখ্যা বাড়ছে। গ্রামে-গঞ্জে পাড়ায় পাড়ায় এখন ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নষ্ট আধুনিকতার সয়লাবে যেখানে আগের ওয়াজ মাহফিলগুলোই বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, নাটক আর গানের আসরে চারপাশ অন্ধকার হয়ে যেতে পারত, সেখানে নতুন নতুন মাহফিলের আয়োজন! অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়এসব ওয়াজ মাহফিলের আয়োজক এলাকার যুব সমাজ। যুবকদের এই চেতনা ও আয়োজনের ব্যাপকতা কিছুদিন আগেও তো দেখা যায় নি। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ এ বাংলাদেশকে যে এগিয়ে যেতে হবে আরো বহুদূর! ইসলামের শীতল ও মহান বাণীকে তৃষ্ণার্ত পৃথিবীর দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে হবে আমাদেরকেই। যে চেতনা ও মানসিক শক্তি বুকে ধারণ করেন ইউরোপিয়ান ক্লাবগুলোর একেকজন মুসলিম ফুটবলারডেমবা কিংবা অন্যরা, অথবা সাউথ আফ্রিকার ক্রিকেটার হাশিম আমলা আর অস্ট্রেলিয়ান উসমান খাজা, সেই চেতনা ও শক্তি নিয়েই আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। এগুতে হবে বর্তমান আধুনিকতার প্রতিটি সেকটরে। ইসলামকে লালন করে ইসলামী সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। নিজেকে জানতে হবে। জানতে হবে নিজেদের ধর্মকেও। যে ধর্মের সজোর টানে আধুনিক মিডিয়ার শক্তিকে অগ্রাহ্য করে ছুটে আসছে আমেরিকা-ইউরোপের যুবক-তরুণেরা, সেই ধর্মের অনুসারী আমাদের প্রত্যেককেই দিকে দিকে জেগে ওঠা এ চেতনায় শরিক হতে হবে। আমাদের প্রত্যেককেও শক্তির সাথে বলতে হবেআমি মুসলমান, আমার কাছে আমার ধর্মই বড়। ইউরোপের ফুটবল মাঠে যদি তা বলা সম্ভব হয়, ধর্মমুক্ত ক্রিকেট মাঠে যদি তা বাস্তবে দেখানো যায়, তাহলে শাহজালাল-শাহপরানের দেশ ওলি-আউলিয়ার এই বাংলাদেশে বাধা কীসের? বাধা যতই কঠিন হোক, পরিবেশ যতই বৈরি হোক, আমাদেরকে জাগতেই হবে। নতুন চেতনার এই মিছিলে আমাদেরকে শরিক হতেই হবে। যদি এমনটা করতে পারি, তাহলে বিজয় আমাদের হবেই।

লেখক : শিক্ষক
জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, ঢাকা
sahmed1386@gmail.com

শহীদ আফ্রিদির বয়ান

ওয়ানডে ক্রিকেটের দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ান, পাকিস্তান ক্রিকেট টিমের সাবেক অধিনায়ক, বিশ্বের জনপ্রিয় হার্ডহিটার ব্যাটসমান ও তারকা অলরাউন্ডার শহীদ আফ্রিদি সম্প্রতি তাবলিগে গিয়ে বয়ান করেন। রহমত পাঠকদের জন্য উর্দু থেকে সেই বয়ানের ভাষান্তর তুলে ধরেছেন

আলী হাসান তৈয়ব

এতক্ষণ কয়েকজন মাওলানা সাহেব আপনাদের দ্বীন বোঝালেন, আমাকেও দ্বীন বোঝালেন। আমার মুখে তাদের মত শব্দের যাদু নেই। তারা যেভাবে বলেছেন, যে আবেগ-অনুভূতির সাথে বলেছেন, তা তো আমার নেই। তাদের কথা শুনতে আমার অনেক ভালো লেগেছে। এখানে জামাতে জামশেদ ভাই (সাবেক প্রখ্যাত পপ গায়ক জুনায়েদ জামশেদ, যিনি তাবলিগের মাধ্যমে দ্বীনদারির জীবন গ্রহণ করেছেন) এসেছেন, আমিও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছি। তিনি আমাদের চেয়ে অনেক বড়। তার সাথে আমার গভীর সম্পর্ক। তিনি একজন বুজুর্গ। তিনি আল্লাহর পথে বেরিয়েছেন। ভাবলাম, তাঁর সাথেসাক্ষাৎ করা দরকার। তার কাছ থেকে দোয়া নেয়া দরকার। আমি তো তাদের মতো আত্মশক্তি অর্জন করতে পারিনি। তবে একথা সত্য, ক্রিকেটের সুবাদে আল্লাহ আমাকে সারা দুনিয়া ঘুরিয়েছেন। সাদা-কালো, ধনী-গরিব সব ধরনের লোকের সাথে ওঠাবসার সুযোগ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে দু'চার কথা বলা যেতে পারে। আমি এমন বহু লোক দেখেছি, যাদের বেতন মাত্র দু' হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা। তাদের সন্তান ৫-৬টি। বিশ্বাস করুন, অথচ তারা দিব্যি প্রশান্ত জীবন কাটাচ্ছেন। ভাবা যায়, এই সময়ে মাত্র দু' হাজার টাকার বেতন ৫-৬টি সন্তান, তারা নিয়মিত স্কুলেও যাচ্ছে, তিনবেলা পেট ভরে খাচ্ছে! তাদের কোনো হা-হুতোশ নেই! আরামে নির্ভার জীবন কাটাচ্ছে। এটা কীভাবে সম্ভব!

আমি মনে করি এটা সম্ভব কেবল এ কারণে, তারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখে। তারা কেবল আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের দু' হাজার বা আড়াই হাজার টাকায় অভাবনীয় বরকত দান করেন। তাই তারা এত অল্প টাকায় দিব্যি সুখে জীবন কাটাতে পারছেন।

তো ভাই, যে জীবনে দ্বীন আছে, যে জীবন আল্লাহর কাছে সমর্পিত, সেটিই সুন্দর জীবন। সেই জেন্দেগি ও সেই ব্যক্তিই দুনিয়া ও আখেরাতে সফল। পক্ষান্তরে যার জীবনে দ্বীন নেই সে বড়ই হতভাগ্য। পাঠানদের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ যে, তারা চাকুরি করে, ব্যবসা করে, সংসার করে, কাজে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু নামাজ ছাড়ে না। আমিও আগে ৩-৪ ওয়াক্ত নামাজ পড়তাম। তবে আমার কাছে তাবলিগের লোকেরা এলে তাদের ভাগিয়ে দিতাম। নিরাপত্তাকর্মীদের দিয়ে তাদের বাসায় ঢুকতে নিষেধ করে দিতাম। একবার আমি মহল্লায় টেপবল খেলছিলাম। এমন সময় সেখানে তাবলিগের লোকেরা এসে হাজির। এবার আর ফাঁকি দিতে পারলাম না।

তাদের কথা শুনতে বাধ্য হলাম। শুনার পর সত্যিই আমি আমার চিন্তার জগতে পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। ভাবতে লাগলাম, নিজে নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, শহীদ আফ্রিদি! তোমাকে আজ না হলে কাল মরতেই হবে। তুমি সঙ্গে কী নিয়ে যাবে? তুমি তো কবরে ছক্কা/চার নিয়ে যাবে না। ক্রিকেটে তোমার সাফল্য সম্পর্কে সেখানে প্রশ্নও করা হবে না। সেখানে প্রশ্ন করা হবে কেবল আমল সম্পর্কে। সে ব্যাপারেই তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে। ক্রিকেট সেখানে তোমার কোনোই কাজে লাগবে না। সেখানে কাজে লাগবে কেবল আমল। আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন না, তুমি কয়টি ছক্কা মেরেছ আর কয়টি উইকেট নিয়েছ! তিনি জিজ্ঞেস করবেন প্রতিদিন নামাজ পড়েছ কয় ওয়াক্ত?

এরপর থেকে আমি তাদের কাছে নিয়মিত যেতে লাগলাম। তিন দিনের জন্য, একদিনের জন্য তাবলিগে যেতে লাগলাম। আল্লাহওলাদের মাহফিলে হাজির হতে লাগলাম। আল্লাহর শোকর, তিনি আমাকে এ মাহফিলেও হাজির হওয়ার তাওফিক দান করেছেন। এভাবে আমি আল্লাহর পথে একটু একটু হাঁটতে শুরু করলাম। আস্তে আস্তে নিজেই নিজের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আমি হেদায়েতের পথে উঠে এলাম। এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সঙ্গে পড়ার চেষ্টা করি। দ্বীনের ওপর চলতে সর্বোচ্চ মেহনত করি। আল্লাহওলাদের সান্নিধ্যে যেতে সচেষ্ট থাকি। তাদের কাছ দ্বীনের বিষয়-আসয় শেখার চিন্তায় থাকি। এদের আমি শুধু আল্লাহওয়ালা নয়, ফেরেশতা বলি। এরা বড় ভালো মানুষ। এদের কুরবানি তুলনাতীত। এরা আরামের বিছানা ছেড়ে, ফুটফুটে শিশু-সন্তান বাড়িতে রেখে জনে জনে পথে পথে অবিরাম দ্বীনের প্রচার করে যাচ্ছেন।

কত বলব। কী বলব। আপনারা সাঈদ আনোয়ার ও জুনায়েদ জামশেদকে জিজ্ঞেস করুন, ক্রিকেট আর সঙ্গীত ছিল যাদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। এই তাবলীগের মাধ্যমে তাদের জীবনটাই পাল্টে গেছে। সেই ভিআইপিদের গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, দ্বীনের মধ্যে কী মজা আছে যে তারা নিজেদের আরামের শয্যা ত্যাগ করে মসজিদের চাটাইয়ে ঘুমাচ্ছেন!

ভাইয়েরা! কেউ যখন আল্লাহর পথে চলে, নিজেকে শুদ্ধ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকে আল্লাহ তাকে দুনিয়াতেই নেয়ামত দিতে থাকেন। সে শান্তির জীবন লাভ করে। সে পেরেশানি মুক্ত অনাবিল জীবন লাভ করে। যে দ্বীনদার সেই প্রকৃত সুখি। সুখের ঠিকানা একমাত্র এটাই।

দ্বীন তো আস্থা ও বিশ্বাসের নাম। আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালি করতে হবে। অটুট অনড় বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। আমাদের একিন তো অর্থ-কড়ি নির্ভর। আমরা মনে করি, যা হয় অর্থ দ্বারা হয়। একথা সত্য যে অর্থের প্রয়োজন আছে। সাথে সাথে একথাও স্বীকার করতে হবে, অর্থ হালাল পথে উপার্জিত হতে হবে। কিন্তু অর্থ কম থাকুক বেশি থাকুক সর্বাবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। নিজের চেয়ে যাঁরা দুর্বল তাদের দিকে তাকাতে হবে। আল্লাহ তো আমাকে তাদের চেয়ে ভালো রেখেছেন।

ভাই! হেদায়েতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘর মসজিদে আসতে হবে কেবল আল্লাহকে খুশি করতে। আমি জানি, এখানে আপনারা অনেকে উপস্থিত হয়েছেন আমার কথা শুনে। আমি তো এক অতি গুনাহগার বান্দা। বন্ধুরা! আমার জন্য কেন কষ্ট করে মসজিদে আসবেন? আল্লাহর জন্য আসুন। আমি আপনাদেরকে কিছুই দিতে পারব না। কেবল হাত মিলিয়ে আমি নিজের কাজে চলে যাব। আল্লাহর কাছে চেয়ে দেখুন, তার হুকুম মেনে চলুন, তিনি উভয় জগতে কামিয়াব করেন।

মাওলানা তারিক জামিলের সাথে বলিউড নায়ক আমির খানের সাক্ষাৎ

ঘৃণা নয় ভালোবাসা বিলিয়ে দিন

ইমতিয়াজ বিন মাহতাব
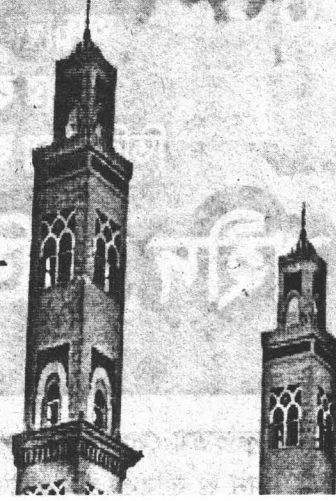
মাওলানা তারিক জামিল উপমহাদেশের একজন প্রসিদ্ধ মুবাল্লিগ ও খ্যাতনামা আলেমে দীন। ইলমের পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালা তাকে বক্তৃতা ও বাককুশলতা দান করেছেন। দাওয়াত ও তাবলিগের একনিষ্ঠ মেহনতের ফলে গোটা মুসলিম বিশ্বে তিনি পরিচিত। অসাধারণ বাগ্মিতার অধিকারী এ কিংবদন্তিতুল্য আলেম দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনতে নিরলস শ্রম ও মেধা ব্যয় করে যাচ্ছেন। মাওলানা ১ জানুয়ারি, ১৯৫৩ সালে পাঞ্জাবের মিয়াচুন্নুতে জন্মগ্রহণ করেন। লাহোরের কিং এডওয়ার্ড মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে ডাক্তারি (এমবিবিএস) পড়া কালে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তিনি শেষবর্ষে লাহোরের রায়বেন্ডে জামিয়া আরাবিয়াতে গিয়ে ইসলামী শিক্ষা অর্জন শুরু করেন। পরিশেষে এমন মুবাল্লিগ হন, শুধু অমুসলিমরাই তার কাছে ইসলামের দীক্ষা নিয়ে সৌভাগ্য অর্জন করছে না, বরং মুসলমানদেরকেও তিনি *মুসলমান* বানাচ্ছেন। তাঁরই পরশে বিখ্যাত পপ গায়ক জুনাইদ জামশিদ ছাড়াও বিখ্যাত ক্রিকেটার ইনজামামুল হক, সাকলাইন মুশতাক, মুশতাক আহমদ ও সাঈদ আনোয়ার প্রমুখও নিজেদের সময়কে দীনের জন্য ব্যয় করা শুরু করেছেন। এমনকি পাকিস্তানের জাতীয় ক্রিকেট দলের ইউসুফ ইয়োহানা নামে পরিচিতি খেলোয়াড় তার ধর্ম ত্যাগ করে দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মদ ইউসুফ হয়ে গেছেন। মাওলানা তারিক জামিলের দাওয়াতী মেহনতের বদৌলতে তারা আজ দ্বীনের দায়ীতে পরিণত হয়েছেন। এ সবই দাওয়াত ও তাবলীগের সুফল।

মাওলানা তারিক জামিলের একটি বয়ানের কিছু অংশ বেশ কিছুদিন যাবত সোশ্যাল মিডিয়াতে খুবই প্রচার হচ্ছে। ভারতের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির খ্যাতনামা অভিনেতা আমির খানের সাথে মাওলানা তারিক জামিলের সাক্ষাতের বিষয়টি বয়ানের এ অংশটুকুতে আলোচিত হয়েছে। মাওলানার সাথে আমির খানের সাক্ষাৎ হয়েছিল পবিত্রভূমি মক্কায়। ২০১২ সালে আমির খান তার মাকে নিয়ে (বলা উচিত মায়ের সাথে) পবিত্র হজ্জ করতে সৌদী আরব যান। সে বছর মাওলানা তারিক জামিল, জুনাইদ জামশিদ এবং বিখ্যাত ক্রিকেটার শহিদ আফ্রিদিও হজ্জ করতে সৌদী আরব যান। সেখানেই তাদের সাথে আমির খানের পরিচয় ঘটে। মাওলানা তারিক জামিল নায়ক আমির খানের সাথে তার সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন

আমির খানের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটলে তার সাথে দীনের কোন কথা বলিনি। সেই সাক্ষাৎকারে তৈরী হয়েছে মুহাব্বত। একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক তৈরী হয়েছে সেই সাক্ষাৎকারে। যার কারণে আজও আমির খানের পক্ষ থেকে টেক্সট মেসেজ আসে। আমির খানের বক্তব্য হচ্ছে, 'আমি জীবনে কখনো কারো দ্বারা প্রভাবিত হইনি। আপনিই প্রথম ব্যক্তি, যার দ্বারা আমি প্রভাবিত।'

আমি তার উপর কোন জাদু করিনি। শুধু হৃদয় থেকে তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেছি। আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানিতে অনেক কষ্টের পর তার সাথে আমার সাক্ষাতের পথ তৈরী হয়। কেননা আমরা একে অন্যকে চিনতাম না। জানতাম না। তার সাথে সাক্ষাতের কোন সুযোগই পাচ্ছিলাম না। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা শহিদ আফ্রিদির মাধ্যমে এ সাক্ষাৎকার সহজ করে দেন। তার সাথে আমার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটল। এ জন্য আমাকে মাত্র আধঘণ্টার জন্য সময় দেয়া হলো। সর্বোচ্চ পৌনে এক ঘণ্টা আমার জন্য সময় বরাদ্দ করা হলো। যখন সাক্ষাৎ করতে গেলাম, তখন আমির খানের চেহারায় ছিল ভয়ের ছাপ না জানি মাওলানা বলে বসেন, এ আপনি কী করছেন? সবই তো হারাম করছেন, নাচছেন, গাইছেন। তাড়াতাড়ি তওবা করুন। নতুবা এখনই আপনার জন্য দোজখের ফয়সালা হয়ে যাবে। এ কারণে আমির খান বেশ শঙ্কায় ছিলেন।

মাওলানা তারিক জামিল তার বয়ানে বলেন, আমার একটা সময় কেটেছে কলেজে। সে সময় তাবলীগের সাথে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। স্কুল ও

কলেজ জীবনে আমি খুব ভালো গায়ক ছিলাম। সবকিছুই করতাম। সাক্ষাতের সময় আমির খান থতমত খেয়ে যান। আমি তার ঘরে বসেই তার সাথে সিনেমার আলাপ শুরু করে দিলাম। আমি খেয়াল করলাম ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সময়ের সিনেমা সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি, তিনি ততটুকু জানেন না। তো তার উপর আমার জানার প্রভাব দেখা গেল। কেননা এটা তার লাইনের জ্ঞান। সে তো হয়রান-পেরেশান হয়ে গেল- ওয়াজ তো হচ্ছে না। কখনও দিলীপ কুমার নিয়ে তো কখনও রাজকুমার নিয়ে আলোচনা। আবার কখনও চলল মদনমোহন নিয়ে আলোচনা। এভাবে আধঘণ্টার সময় এমননিতেই পার হয়ে গেল। আমরা খাবার টেবিলে ছিলাম। আলোচনা পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত চলল। আমরা খাবার টেবিল থেকে উঠে অন্যত্র বসলাম। ততক্ষণে আমির খানের সকল ভয় দূর হয়ে গেছে।

আমি বললাম, আমির ভাই! আমরা হজ্জ করতে এসেছি। যদি অনুমতি দেন, তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হজ্জের কাহিনী শুনাতে পারি। এরপর আরও সোয়া ঘণ্টা সময় নিয়ে কথা বললাম। আমির খান এক মুহূর্তের জন্যও বিরক্তি প্রকাশ করেননি। নড়াচড়াও করেননি। এটা ছিল তার ভালোবাসা ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ। আমরা অনেকেই আগেই ফতওয়া দেওয়া শুরু করে দিই। বলি এটা আমার পছন্দ হয়নি। এটা কেন হচ্ছে, ইত্যাদি।

দুঘণ্টা পর আমির খান আমাদের বিদায় জানাতে নিচে পর্যন্ত নেমে এলেন। যেখানে তিনি সময় দিচ্ছিলেন না, অনেক কষ্ট করে আধঘণ্টা সময়ের অনুমতি মিলল। অথচ দুঘণ্টা সময় দেয়ার পরও তিনি শুধু বিদায় জানাননি, বরং নিচ পর্যন্ত নেমে এলেন। এটা ছিল তার হৃদয়ে জায়গা করে নেওয়ার প্রমাণ।

যাই হোক, বিদায় মুহূর্তে আমি তাকে বললাম, হজ্জের পরে আরও একবার সাক্ষাৎ হওয়া দরকার। তিনি জবাব দিলেন, অবশ্যই হবে। কিন্তু পরবর্তীতে একদিন তার কাছ থেকে বার্তা এল, ক্ষমা চাচ্ছি, আমি মক্কা থেকে মদীনায় চলে এসেছি। আমি বললাম, সমস্যা নেই। আমি মদীনায় চলে আসছি। অথচ এর আগেই আমি মদীনার নির্ধারিত সফর শেষ করে এসেছি। আমির খান বললেন, আপনি ১৪ নভেম্বর চলে আসেন। আপনার জন্য বিকাল ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত সময় বরাদ্দ করা হলো। আমি জুনাইদ জামশীদ ও আরও একজনকে নিয়ে আমির খানের সাথে সাক্ষাতের জন্য মদীনায় রওনা দিলাম। সোয়া ৪টায় আমাদের আলাপ শুরু হলো। চলল টানা সোয়া ১০টা পর্যন্ত। দুঘণ্টার জায়গায় ছয় ঘণ্টা আলাপচারিতার পরও আমির খানের মন চাচ্ছিল না আমরা উঠি।

হজ্জের সফরের পর আমি একদিন রায়ভেন্দ ইজতেমাতে আছি। এমন সময় এক বিশাল পরীক্ষার সম্মুখীন হলাম। আমার মোবাইলে আমির খানের মেসেজ এল- আমার নতুন সিনেমা *তালাশ* আসছে। তার সফলতার জন্য দোয়া করবেন।

এক্ষেত্রে তার জবাবও দিতে হবে, আবার দোয়াও করা যাবে না। মেসেজটি যখন আসে, তখন আমার সামনে দশ-বারোজন আলেম বসেছিলেন। তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, কী করব এখন? তারা বললেন, ভাই, এটা তোমার ময়দান। তুমিই জান কী করতে হবে। এরপর আমি সারাদিন এটা নিয়ে ভাবলাম। পরের দিনও চলে যাচ্ছে। আসরের সময় ওজু করছি- এমন সময় আল্লাহ তায়ালা আমার মাথায় একটা বিষয় ঢেলে দিলেন। আমি আমির খানকে মেসেজ পাঠালাম- আমির ভাই! আল্লাহ তায়ালা কাউকে কাউকে সৃষ্টিশীল মেধা দান করেন। আপনার সাথে আমার যতটুকু সময় কেটেছে, আমি অনুভব করেছি, আপনি একজন সৃষ্টিশীল মানুষ। আর সৃষ্টিশীল মানুষ কখনো সফলতা-ব্যর্থতার পরওয়া করেন না। তিনি শুধু কাজ করে যান।

মেসেজ পাঠানোমাত্র তার জবাব এল- আপনি ঠিক বলেছেন।

আমির খান সর্বদা ফোন করার আগে এসএমএস-এর মাধ্যমে জেনে নেন, কথা বলা যাবে কিনা। কখনো মাওলানা নিজে কল করেন, কখনো এসএমএস-এর মাধ্যমে হ্যাঁ বলে দেন। একবার আমির খানকে এসএমএস করার পরই তার কল এল। আমির খান বললেন, আমি দিল্লিতে। যখন আপনার মেসেজ আসে তখন আমি দিল্লি কনফারেন্সে ছিলাম। এখন বাইরে এসে আপনাকে কল দিলাম। এ কথার ফাঁকেই আমির খান বললেন, মাওলানা! আপনার দোয়ার বরকতে সিনেমাটি সফল হয়েছে!

বয়ানের শেষে মাওলানা তারিক জামিল হেসে বলেন, আমি কখন তার জন্য দোয়া করলাম?

পরিশেষে তিনি বললেন, ভাইয়েরা আমার! ভালোবাসা বিলিয়ে দিন। ঘৃণা তো অনেক ছড়িয়ে পড়েছে।

মাওলানা তারিক জামিল তার জ্ঞান ও কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে বিখ্যাত সিনেমা অভিনেতাকে দূরে ঠেলে না দিয়ে বরং ভালোবাসার খাঁচায় বন্দী করেছেন। কটাক্ষ ও সহিংসতার মাধ্যমে মানুষের মন জয় করা যায় না। ভালোবাসা দিয়েই মানুষের মনে স্থান করে নিতে হয়।

ahmadimtiajdr@gmail.com
***লেখক:** গবেষক, অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক

মা'র হাতে আঁকা স্বাধীনতার পতাকাটি আকাশে উড়িয়েছিলেন যিনি

শাহ্ মুহিউদ্দীন মুহাম্মাদ আনিছ

বিজ্ঞ আলিমে দ্বীন, প্রাজ্ঞ ইসলামী চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ ও নিবেদিত সমাজসেবক আল্লামা শাহ্ মুহাম্মাদ বেদারুল আলম রহ. ১৩৭৭ হি. অনুযায়ী ১৩৬৪ বা./ ১৯৫৮ ঈ. সনে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানাধীন রুহুল্লাহ্পুর গ্রামে বিখ্যাত জমিদার খান্দান 'কাযী' পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব আল্লামা শাহ্ আবদুল ওয়াহ্হাব ইসলামাবাদী রহ. (জ. ১৩১৩ হি./ ১৮৯৫ ঈ., মৃ. ১৪০২ হি./ ১৯৮২ ঈ.), তাঁর মুহতারামা মাতার নাম মুসাম্মাৎ ছকিনা বেগম রহ.। শাহ্ সাহেব রহ.'র তের জন সন্তান-সন্ততি (পাঁচ পুত্র, আট কন্যা)'র মধ্যে তিনি ছিলেন একাদশতম। তাঁর বংশ পরম্পরা হলো– শাহ্ মুহাম্মাদ বেদারুল আলম ইবনে শাহ্ আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনে কাযী আবদুল হাকীম সারেং ইবনে কাযী আফী উদ্দীন ইবনে কাযী আসয়াদ আলী ইবনে কাযী নাসির উদ্দীন ইস্পাহানী রহ.। ইরানের ইস্পাহান নগরীর অধিবাসী কাযী নাসির উদ্দীন রহ. ছিলেন ইমামুল হিন্দ আল্লামা শায়খ শাহ্ আহমাদ রহ. (জ. ১১১৪ হি./ ১৭০৩ ঈ., মৃ. ১১৭৬ হি./ ১৭৬২ ঈ.)'র সমসাময়িক; যিনি শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহ্লভী নামে জগদ্বিখ্যাত। পরে দ্বীন প্রচারের নিমিত্তে প্রথমে মায়ানমারের রেঙ্গুন শহরে স্ব-পরিবারে হিজরত করেন। তথায় বেশ কয়েক বছর অবস্থান করার পর বাংলাদেশের সন্দ্বীপে এসে বসবাস শুরু করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই পুত্র কাযী আসয়াদ আলী হাটহাজারী থানার রুহুল্লাহ্পুর গ্রামে এসে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলেন।

ধারাবাহিক অধ্যবসায়, সময়ানুবর্তিতা, সুষম নিয়ম-শৃংখলা, বিনম্র আচরণ, অসাধারণ ধী-শক্তি, শিক্ষকগণের আনুগত্য ও সেবা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, দরসে প্রায় শতভাগ উপস্থিতি, সুন্দর হস্তাক্ষর ইত্যাদি কারণে তিনি সহজেই আকাবিরে হাটহাজারীর নেক নযর আকর্ষণে ধন্য হন। জামিয়া আহ্লিয়ায় অধ্যয়নকালেও তাঁর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন নিজ পিতা শাহ্ আব্দুল ওয়াহাব সাহেব রহ.।

দাওরা-ই-হাদীস উত্তীর্ণ হওয়ার পর পরই তিনি জামিয়া আহ্লিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারীতে 'উস্তাদ' হিসাবে সরাসরি নিয়োগ লাভ করেন।

তিনি জামিয়া আহ্লিয়া দারুল উলূম হাটহাজারীর ছয় সদস্যবিশিষ্ট মজলিসে ইল্মী (পরিচালনা পরিষদ)'র অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৯৫ সালে ০২ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত জামিয়ার প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী মহাসম্মেলন ও দস্তারবন্দী অনুষ্ঠান [মাদ্রাসার একশতম বার্ষিক সম্মেলন এবং অত্র মাদ্রাসায় দাওরা-ই-হাদীস চালু হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি তথা ১৩২৬ হি./ ১৯০৮ ঈ. - ১৪১৫ হি./ ১৯৯৫ ঈ. পর্যন্ত যে সকল ছাত্র এখান থেকে দাওরা-ই-হাদীস সম্পন্ন করেছে তাঁদেরকে বিশেষ পাগড়ী প্রদান অনুষ্ঠান] সফল হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আর তাঁরই উদ্যোগে উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট আলিমে দ্বীনকে (যাঁদের এই জামিয়ায় পড়ালেখার সুযোগ হয়নি) সম্মানসূচক পাগড়ী প্রদান করা হয়। এছাড়াও তিনি মাদ্রাসার আভ্যন্তরীন ও বহির্বিভাগের কাজ অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে আঞ্জাম দিতেন। মুহ্তামিম মাওলানা আহমাদ শফী দা.বা.'র অবর্তমানে তিনি ইহ্তিমামের দায়িত্ব পালন করতেন। ১৯৮৫ ঈ. সনে মাওদূদীপন্থীদের হাতে অনাকাঙ্ক্ষিত-অতর্কিতে হামলার শিকার হয় জামিয়া আহ্লিয়া, হাটহাজারী। তখন জামিয়া রক্ষার্থে দুষ্কৃতকারীদের প্রতিরোধে তিনি বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সেই বীরত্বের কারণে তৎকালীন জামিয়া প্রধান আল্লামা হাফেয হামেদ রহ. তাঁকে 'স্বভাব-সাহসী' লকবে অভিষিক্ত করেন।

তিনি ছিলেন রাজনীতি সচেতন। ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন বাংলাদেশ (বর্তমান নাম– ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)'র হাটহাজারী উপজেলার সভাপতি, পরবর্তীতে ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ নেযামে ইসলাম পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোট চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সভাপতি, চারদলীয় জোট উত্তর জেলা হাটহাজারী থানার সমন্বয়কারী এবং বাংলাদেশ ইসলামী দাওয়াতী কাফেলার মজলিসে শূরা/সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী কমিটির অন্যতম সদস্যের দায়িত্ব ছাড়াও আরো বিভিন্ন সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ইসলামবিরোধী যে কোন কর্মকাণ্ড– হোক তা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে অথবা অন্য যে কোন উপায়ে, তিনি এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন, প্রতিরোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

রাজনীতি ছাড়াও বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক

কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে নিবিড়ভাবে জড়িত রেখেছিলেন। দেশ, জাতি, সমাজ ও ইসলামের সেবা এবং দ্বীনী শিক্ষা সংস্কারের কাজে নিজেকে এমনভাবে উৎসর্গিত করেছেন, যার দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁর ইন্তিকালের পর বিশিষ্ট নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া ছিল- 'নিজ পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে সমাজকল্যাণমূলক কাজ করার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন শাহ্ মুহাম্মাদ বেদারুল আলম রহ.।' ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্যে বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থা ও আয়োজনকে তিনি খুবই গুরুত্ব দিতেন। তিনি চাইতেন- দাওয়াত ও তাবলীগের নিমিত্তে তত্ত্ব ও তথ্যবহুল বিশ্বস্ত মৌলিক গ্রন্থাদি প্রকাশিত হোক। যেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্টদের এবং সরকারী-বেসরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হিদায়াত-এর মাধ্যম রূপে সে সব প্রকাশনা পরিগণিত হতে পারে। এ মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'আল-হেলাল প্রকাশনী'। যা সুশীল সমাজে ইসলামময় আবেদন তৈরিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল। গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাকসহ বিভিন্ন এনজিও সংস্থা সাধারণ জনগণকে ক্ষুদ্রঋণ দেওয়ার নামে সুদের যাঁতাকল চাপিয়ে দিয়ে শোষণ করতে থাকলে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি বলতেন, 'আমরা যদি এর বিকল্প কিছুর ব্যবস্থা না করি, তাহলে সাধারণ মানুষ-যারা এসব এনজিও থেকে ঋণ নিচ্ছে, তারা অবশ্যই সমস্যায় পড়ে ঋণ নিচ্ছে, তারা সুদের যাঁতাকলে আটকা পড়ে সমস্যাগ্রস্থ থেকে আরো সমস্যাগ্রস্থ, গরীব থেকে আরো গরীব হতে থাকবে। ফলে সমাজে দারিদ্র্যের কষাঘাত আরও বিস্তার লাভ করবে।' এই ভাবনা থেকে তিনি বহু পরিশ্রমের বিনিময়ে ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'স্বদেশ সংঘ' নামে শতভাগ সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের একটি সংগঠন। এটি বর্তমানে উত্তর চট্টলার সম্পূর্ণ সুদমুক্ত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। তিনি আজীবন এই সংগঠনের 'প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি' ছিলেন। এছাড়াও জামিয়া আহ্লিয়া দারুল উলূম হাটহাজারীর শিক্ষকমণ্ডলীর কল্যাণ সমিতি 'লাজ্নাতুল আমানাহ্' ১৪২০ হি./ ১৯৯৯ ঈ. সালে তাঁরই হাতে গড়ে উঠে এবং এর সংবিধান রচনা করে অসামান্য কৃতিত্বের সাক্ষর রাখেন। পবিত্র হজ্জ পালনকালে অনাকাঙ্ক্ষিত যাতনা-বঞ্চনা লাঘবে ও শরয়ী পন্থায় হজ্জের সকল আমল সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপামর ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণের বিশেষ অনুরোধে গত শতাব্দীর শেষভাগে প্রতিষ্ঠা করেন 'আল্লাহুম্মা আমীন' নামক ব্যতিক্রমধর্মী হজ্জ কাফেলা। অলাভজনক এই হজ্জ কাফেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল- ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনা, আমানতদারি ও সফল প্রত্যাবর্তন।

বুযুর্গ পিতার ঘোষণার পর শতভাগ নিশ্চিত হয়ে একজন বালক কর্তৃক বিজয় অর্জনের দু' দিন পূর্বে নিজ গৃহের শীর্ষচূড়ায় নিজ জননীর হাতে সেলাইকৃত নিজ দেশের পতাকা বেঁধে এভাবে বিজয়ের স্বাদ নেয়ার ঘটনা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে যে দ্বিতীয়টি নেই- তা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়

বিধর্মীদের সাহায্য-সহযোগিতা ও পরামর্শে পরিচালিত ব্র্যাক স্কুল, প্রশিকা, কে.জি.-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আধুনিক শিক্ষার নামে কোমলমতি মুসলিম সন্তানদের কুরআন শিক্ষা থেকে দূরে রাখার ষড়যন্ত্র তাঁকে সর্বদা চিন্তিত রাখতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সুদূরপ্রসারী মিশন শুরু করেন, যাতে মুসলিমদের সন্তানেরা আধুনিক শিক্ষার নামে কুরআন কারীমের তালীম থেকে বঞ্চিত না হয়। এই মিশনকে সামনে রেখে তিনি সর্বপ্রথম ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'ইসলামিয়া আরাবিয়া তালীমুল কুরআন মাদ্রাসা' (নূরানী মাদ্রাসা ও হেফ্যখানা), আলীপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। তিনি বলতেন- 'উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. একাধারে আলিমা, মুফাসসিরা, মুহাদ্দিসা, ফকীহা, মুয়াল্লিমা ছিলেন। যদি আমরা নারী সমাজের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব না দিই, তাহলে বিধর্মীরা নারী সমাজকে কুশিক্ষায় শিক্ষিত করে ইসলামের প্রভূত ক্ষতি সাধন করবে।' এই চিন্তাকে সামনে রেখে তিনি ১৯৯৯ সনে নিজ পৈত্রিক জায়গায় প্রতিষ্ঠা করলেন 'খাদীজাতুল কুবরা রাযি. মহিলা মাদ্রাসা', সাত্তারঘাট, রুহুল্লাহ্পুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। উল্লেখ্য, এ মহিলা মাদ্রাসাটি উত্তর চট্টগ্রামের সর্বপ্রথম মহিলা মাদ্রাসা। তিনি আরেকটি কথা প্রায়ই বলতেন। আর তা হচ্ছে- 'ইসলাম ধর্ম হচ্ছে সর্বকালের সর্বস্থানের জীবনোপযোগী স্বভাবধর্ম। সুতরাং এই ধর্মের শিক্ষাও হতে হবে সার্বজনীন।' তাই তাঁর পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতায় ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ইসলামী ও যুগোপযোগী শিক্ষার সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠ 'আদর্শ ইসলামিক একাডেমী', হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। তিনি আজীবন এ প্রতিষ্ঠানের 'প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা' ছিলেন। এভাবে, অসংখ্য মাদ্রাসা/ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাঁরই পরামর্শ ও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলার জমিনে। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন মাদ্রাসার মজলিসে শূরা তথা সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আর তিনি তাঁর জনক শাহ্ আবদুল ওয়াহ্হাব ইসলামাবাদী রহ.'র হাতে গড়া দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের আজীবন পৃষ্ঠপোষক ও প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন।

মাদ্রাসার পাশাপাশি বিভিন্ন মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কারে তাঁর মৌলিক অবদান রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, হাটহাজারী কাচারী রোডস্থ 'সাব রেজিস্ট্রারী অফিস জামে মসজিদ'-যা সেমিপাকা থেকে দালান অবকাঠামোতে পুনঃনির্মিত হয়ে বর্তমানে 'ওসমান বিন আফ্ফান রাযি. জামে মসজিদ'-এ রূপান্তরিত হয়েছে-স্থাপনে তিনি ছিলেন অগ্রগামী, যার সম্মানস্বরূপ তাঁর অনীহা সত্ত্বেও মসজিদ পরিচালনা পরিষদ তাঁকে 'প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি' পদে নির্বাচিত করে। হাটহাজারী কেন্দ্রীয় ঈদগাহের উন্নয়ন, সর্বজনগ্রাহ্য কমিটি প্রণয়ন ও উক্ত ঈদগাহ্তে দল-মত-স্তর নির্বিশেষে ধর্মপ্রাণ হাটহাজারীবাসীকে মাত্র একটি জামাতে ঈদের নামাযে একত্রিত করার কৃতিত্ব তাঁরই। এ সুকীর্তির কারণে কৃতজ্ঞ হাটহাজারীবাসী পরবর্তীতে তাঁকে কেন্দ্রীয় ঈদগাহ্ কমিটির 'সভাপতি'-এর সম্মান প্রদান করে। সর্বোপরি বলা যায়- ধর্মীয় এমন কোন ক্ষেত্র নেই, যেখানে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেননি।

আধ্যাত্মিক জীবনে তিনি হাকীমুল উম্মত আল্লামা শাহ্ আশরাফ আলী থানভী রহ.'র সর্বশেষ খলীফা মুহিউস সুন্নাহ্ আল্লামা শাহ্ আবরারুল হক (হারদুঈ হযরত) রহ.'র পবিত্র হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। রাজনীতির অঙ্গনে তিনি খতীবে আযম

আল্লামা সিদ্দীক আহমাদ রহ. ও আমীরে শরীয়ত আল্লামা মুহাম্মাদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুযূর রহ.'র আদর্শ ও কর্মনীতিকে অনুসরণ করতেন।

সত্যি বলতে কী– অনুসরণ ও অনুকরণ করার মত অনেক মানবীয় গুণ তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। তিনি উদারমনা, হৃদয়বান ও নম্রভাষী অথচ জালালী মেযাজের অধিকারী ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি স্বীয় বিজ্ঞ পিতা-মাতার অনুগত, বাধ্য, নম্র-ভদ্র ও নিরহংকারী ছিলেন। এত জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা এবং শরীয়তের প্রভূত ইল্‌মের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে খুবই ছোট মনে করতেন। বস্তুতঃ যাঁদের জ্ঞান হয় পুঁজি, আধ্যাত্মিকতা হয় শক্তি, বিনয়ী হয় মেযাজ আর আখলাক হয় সাথী– তাঁদের চরিত্র এমনই হয়। অপরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া এবং অতিথিপরায়ণতা ছিল তাঁর মজ্জাগত। শেষোক্ত দুই গুণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য। কোন মানুষ দুঃখে পতিত হয়ে টাকার জন্য তাঁর দারস্থ হয়েছে। কেউ সাধারণভাবে তাঁর মেহমান হয়েছে। এমতাবস্থায় তাঁর হাতে কোন টাকা নেই। তখন দেখা যেত, তিনি কর্য করে হলেও দুঃখীর দুঃখ মোচন করতেন। মেযবানের দায়িত্ব পালন করতেন। সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত তাঁর রুমে বা ঘরে একের পর এক মেহমান আসতেই থাকত। তিনি কমপক্ষে চা-বিস্কুট না খাইয়ে কোন মেহমানকে বিদায় দিতেন না। যে কোন মানুষের উপকার করতে পারলেই তিনি খুশী হতেন। তাঁর সারাটা জীবন ব্যয় হয়েছে মানুষের সেবায় ও অপরের কল্যাণ চিন্তায়ই। বিশেষ করে– দুঃখী, দরিদ্র, পীড়িত ও বিপদগ্রস্থ মানুষের সেবায় তিনি নিজেকে সর্বদা নিয়োজিত রাখতেন এবং এ কাজে তিনি খুব আনন্দ লাভ করতেন। অনেকে তাঁর কাছে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসতেন। কিন্তু কখনো 'আমি পারবো না, আমার দ্বারা সম্ভব নয় বা এখন আমার সময় নেই'– এমন কথা বলতে তাঁকে শুনা যায়নি। কাউকে আর্থিক সহযোগিতা করতেন, কারো জন্য টেলিফোন করে বা চিঠির মাধ্যমে সুপারিশ করতেন, আবার পরামর্শ দিয়ে সান্ত্বনা দিতেন। কখনো কাউকে নিরাশ করতেন না। তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের কারো পিতা-মাতা, সন্তান বা আত্মীয়-স্বজন অসুস্থ হলে তিনি নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখতেন। আর ইন্তিকাল করলে জানাযার নামাযে শরীক হতেন, সমবেদনা প্রকাশ করে সান্ত্বনা দিতেন, উত্তম পুরস্কারের দোয়া করতেন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করতেন। কোন পরিবারের আর্থিক সঙ্কট থাকলে তা দূর করার চেষ্টা করতেন।

ছোট-বড় সকলের সাথে হাসিমুখে কথা বলার ব্যাপারে তাঁর জুড়ি ছিল না। তিনি সকলকেই হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন। ছোটদের প্রতি মায়া-দয়া, বড়দের তাযীম এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামা কিরাম, পীর-মাশায়েখের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল তাঁর। তাঁর মুরব্বী, সমবয়স্ক, সহপাঠী, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, আত্মীয়-স্বজন ও অধীনস্থ সকল লোকের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ও অফুরন্ত ভালবাসা উন্মুক্ত ও অবারিত ছিল। তিনি অনেক উদার ছিলেন। সাধাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করতেন। লৌকিকতার ধারে-কাছেও ছিলেন না তিনি। সদা হাস্যোজ্জ্বল, মিষ্টিভাষী পর-আপন নির্বিশেষে সকলের প্রতি মানবতাসুলভ আচরণ করতেন। আর এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি এত ঔদার্যের অধিকারী ছিলেন যে, শত্রুদের সাথেও তিনি সদ্ব্যবহার করতেন। তাঁর কোন শত্রুও বলতে পারবে না যে, তার সাথে তিনি ব্যক্তিগতভাবে খারাপ আচরণ করেছেন।

তাঁর জীবনের সবচে' বড় দিক হলো– সুস্পষ্টবাদিতা, বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, মুখ ও অন্তরের মিল। অন্তরে যা আছে তা উচ্চারণ করতে তিনি কখনও দ্বিধাবোধ করতেন না।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা রাযি. বলেন– 'রাসূলুল্লাহ্ সা. আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন মানুষকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী মূল্যায়ন করি।' তিনি এই হাদীসের উপর আমল করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। বলা যায়, করেছেনও। জ্ঞানী লোককে তিনি অবশ্যই জ্ঞান অনুযায়ীই মূল্যায়ন করতেন। তিনি বলতেন– 'যদি মানুষকে তাঁর যোগ্যতা অনুসারে মূল্যায়ন করা না হয় অর্থাৎ, অযোগ্যকে যোগ্যের আসনে আসীন করা আর যোগ্যকে অবমূল্যায়ন করা– এটাতো কিয়ামতকে ত্বরান্বিত করারই নামান্তর।' কারণ, হুযূর সা. বলেছেন– 'যখন (যোগ্য ব্যক্তিদেরকে বাদ দিয়ে) অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে বিষয়সমূহ ন্যস্ত করা হবে, তখন তোমরা কেয়ামতের অপেক্ষায় থাক।'

তিনি ছিলেন তাওয়াক্কুল বিল্লাহ্‌র বাস্তব নমুনা। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে অল্প সময়ে যে মাকাম দান করেছেন, তিনি চাইলে পারতেন অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতে। কিন্তু তিনি তা করেননি। একজন প্রভাবশালী সমাজপতি ও দাপুটে রাজনীতিবিদ হয়েও বিত্তের পাহাড় গড়ার ইচ্ছা তাঁকে স্পর্শ করেনি এতটুকুন। এমন কী, তিনি কোন ব্যাংক একাউন্টও খোলেননি। তিনি বলতেন, ব্যাংকে একাউন্ট খোলার অর্থ হচ্ছে, তাতে টাকা-পয়সা জমা রাখা। আর এটা তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ্‌র বিপরীত। বস্তুতঃ মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও সু-সম্পর্কটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রকৃত পুঁজি।

রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, 'পিতা তার সন্তানদের জন্য উত্তম আদর্শের চেয়ে ভাল কিছু রেখে যেতে পারে না।' তিনি ছিলেন আমাদের জন্য এই হাদীসের বাস্তব নমুনা। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। চলে গেছেন না ফিরার দেশে, পরম দয়াময়ের সান্নিধ্যে। কিন্তু তিনি রেখে গেছেন 'আদর্শ'। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি আদর্শ। পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, লেনদেন তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাবা আমাদের মডেল। তিনি অঢেল ধন-সম্পদ রেখে যাননি, রেখে গেছেন আদর্শ ও জীবন চলার পাথেয়। তাঁর এই দুনিয়াবিমুখতার কারণে আমরা ছয় ভাই, তিন বোনের মধ্যে বড় তিনজন আলিম, চার ভাই ও কনিষ্ঠা বোন হাফেযে কুরআন এবং কনিষ্ঠ ভাই (শাহ্ জিয়াউদ্দীন মুহাম্মাদ আজাদ) হেফ্যরত। তৈয়্যিবা ইসলামিক একাডেমী, হাটহাজারীতে লেখকের ছোট তিন ভাই, তিন বোন লেখাপড়া করেছে। আর তারা প্রত্যেকেই ক্লাশে 'ফার্ষ্ট' ছিল। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৯ ঈ. সনে ঢাকাস্থ 'এ.বি ফাউন্ডেশন লি.' কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে তিনি 'শ্রেষ্ঠ পিতা' নির্বাচিত হন।

১৯৭১ ঈ. সনের স্বাধীনতা সংগ্রামে সফলতা ও মুক্তিযুদ্ধে দ্রুত বিজয় অর্জনের নেপথ্যে আল্লামা শাহ্ আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইসলামাবাদী রহ.'র রয়েছে বহু পার্থিব ও অপার্থিব অবদান। ১৯৭১ সালের ১৪ (চৌদ্দ) ডিসেম্বর আসরের সময় দু' আঙ্গুল দেখিয়ে বলেছিলেন– 'আর মাত্র দু' দিন বাকী আছে।' এ ঘটনার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন শাহ্ বেদার্ সাহেব রহ.। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র তের বছর। এ ঘটনার পর তিনি সালাতুল আসরের পর খুব দ্রুত 'শাহ্ মনযিল'-এ ফিরে আসেন এবং শাহ্ মনযিলের চিলেকোঠার উপর নির্মিত গম্বুজের চূড়ায় স্বীয় জননীর পবিত্র হাতে সেলাইকৃত বাংলাদেশের মানচিত্র সম্বলিত লাল-সবুজের পতাকা লাগিয়ে দেন। আর বিজয়ানন্দে গেয়ে উঠেন–

'বড় মুহ্‌তামিমের সত্য বাক,
যালিমেরা নিপাত যাক।
দোয়া করেছেন কুত্‌বুল ইরশাদ,
প্রিয় বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।'

বুযুর্গ পিতার ঘোষণার পর শতভাগ নিশ্চিত হয়ে একজন বালক কর্তৃক বিজয় অর্জনের দু' দিন পূর্বে নিজ গৃহের শীর্ষচূড়ায় নিজ জননীর হাতে সেলাইকৃত নিজ দেশের পতাকা বেঁধে এভাবে বিজয়ের স্বাদ নেয়ার ঘটনা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে যে দ্বিতীয়টি নেই– তা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়।

২৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ ঈ. বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেদিন বিকালে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে হাটহাজারীস্থ 'লাইফ-লাইন' ক্লিনিকে ভর্তি করানো হয়। অসুখ বেড়ে যাওয়াতে পরদিন সেখান থেকে চট্টগ্রামের পাঁচলাইশের 'একুশে হাসপাতাল'-এ, এরপর 'চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল'-এ ভর্তি করা হয়। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩য় তলায় ১৭ নং ওয়ার্ড (কিডনী বিভাগ)'র ০২ নং বেডে অসুস্থ অবস্থায় এক সপ্তাহকাল যাপনের পর ১৪ মুহার্‌রাম ১৪২৫ হি., ২৩ ফাল্গুন ১৪১০ বা., ০৬ মার্চ ২০০৪ ঈ. শনিবার বিকাল ৩টা ১০ মিনিটে হাসপাতালের বেডেই এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে চলে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। ইন্‌তিকালের সময় চাঁদ হিসাবে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর আর সৌর বছর হিসাবে ৪৬ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ০৬ ছেলে, ০৩ মেয়ে, ছাত্র-ভক্ত ও আত্মীয়-স্বজনসহ অগণিত গুণগ্রাহী রেখে যান।

তাঁর ইন্‌তিকালের সংবাদ মুহূর্তের মধ্যেই বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়ে সৌদী আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, ওমান এবং বাহরাইনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে-যেখানে তাঁর এবং জামিয়ার অসংখ্য ছাত্র-ফারেগীন দ্বীনী খিদ্‌মাতে রত আছেন। আছেন আত্মীয়-স্বজনরা। সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ প্রচারিত করা হয় এবং জাতীয় পত্রিকাসমূহেও তাঁর ইন্‌তিকালের খবর ছাপানো হয়। সেদিনই রাত ৯টায় জানাযার নামাযের সময় ঘোষণা করা হয়। তাঁর মরদেহ জামিয়ার পুরাতন শরহে বেকায়া দর্‌সেগাহে রাখা হয়। লাইন ধরে ফিদায়ে মিল্লাত শাহ্ সাহেব রহ.'র চেহারা মুবারক একবার দেখার জন্য নিয়ম করে দেন জামিয়া কর্তৃপক্ষ। শুভাকাঙ্ক্ষীরা আসতে থাকে চতুর্দিক থেকে। চারিদিকে শত-সহস্র মানুষের ঢল। এতো অল্প সময়ে এতো জনসমাগম সকলকে হতবাক করে দেয়। এ জনসমুদ্র তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর মৃত্যুর শোকবার্তায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্যাডে সাবেক সাংসদ ও বিরোধী দলীয় হুইপ সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম বলেন, 'আলহাজ্জ মাওলানা বেদারুল আলম সাহেব রহ.'র মৃত্যুতে চট্টগ্রাম তথা দেশবাসী এক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিভাবান ধর্মানুরাগী এবং নিবেদিত সমাজসেবককে হারালো, যা সত্যিই অপূরণীয়।'

অতঃপর পূর্ব ঘোষিত নির্ধারিত সময়ে মাওলানা আহমাদ শফী দা.বা.'র ইমামতিতে লক্ষাধিক মুসল্লীর অংশগ্রহণে জামিয়া ক্যাম্পাসে জানাযার নামায সম্পন্ন হয়। জানাযা শেষে জামিয়ার বায়তুল আতীক জামে মসজিদ সংলগ্ন জামিয়ার শিক্ষকমণ্ডলী ও কর্মকর্তাগণের জন্যে নির্ধারিত নতুন কবরস্তানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। এই কবরস্থানে এটিই প্রথম কবর। তাঁর পুণ্যস্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে এ গোরস্থানের নামকরণ করা হয় 'মাক্ববারায়ে বেদারিয়া'। আমি ও আমরা মহান আল্লাহ্‌র শাহী দরবারে আকুল আকুতি করছি– তিনি যেন তাঁর এ প্রিয় বান্দার সমস্ত নেক আমলকে কবূল করেন এবং কসূরগুলোকে ক্ষমা করে তাঁর কবরকে বেহেশ্‌তী উদ্যানে পরিণত করেন ও তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের সর্বোত্তম স্থানে অধিষ্ঠিত করেন।

আপনার সন্তান কি মাদকাসক্ত?

দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দীনদার ব্যক্তির সাহচর্যে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

হলি লাইফ

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত]

মাদকাসক্তি ও মানসিকরোগ নিরাময় কেন্দ্র

বি.দ্র. যারা এসিতে অভ্যস্থ তাদের জন্য এসি কক্ষের ব্যবস্থা আছে।

৪৮৫ ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা।

ফোন : ৯৩৩৭০৫৭, মোবাইল : ০১৯১৬৩৮৫৩৮২, ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১০-০১৭২৬২

এ সপ্তাহেই শহীদরা ফিরে আসছে

আল তাহের ওয়াত্তার

[লেখক পরিচিতি : আল তাহের ওয়াত্তার (১৯৩৬-২০১০) পূর্ব আলজেরিয়ার এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ঔপন্যাসিক ও গল্পকার আল তাহের ওয়াত্তার। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন স্থানীয় মকতবে। ভাষা ও ধর্মের উপর উচ্চশিক্ষা নেন ইস্তাম্বুল এবং তিউনিসিয়ার আল যায়তুন মসজিদে। ওয়াত্তার সিরিয়াস ও কঠিন বিষয় নিয়ে গল্প লিখলেও সফল গল্পকারের মতো তার গল্পে পূর্ণতার সকল উপাদান বিদ্যমান যা পাঠককে গল্পটি পড়তে আগ্রহী করে তোলে। তিনি উত্তর আফ্রিকার একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। প্রথম উপন্যাস আলজেরিয়ান বিপ্লব নিয়ে রচিত আল লাজ (১৯৭৮) তাকে আরববিশ্বে ব্যাপক পরিচিত করে তোলে। তার উল্লেখযোগ্যে উপন্যাসের মধ্যে ভূমিকম্প, একটি ঘোড়ার বিয়ে, জেলে ও একটি প্রাসাদ, ভালোবাসার অভিজ্ঞতা এবং মোম ও করিডোর। ছোটগল্প সমগ্র ও দু'টি নাটকও আছে তার। ওয়াত্তার আলজেরিয়ার উপনিবেশ পরবর্তী সমস্যা ও সমাধান নিয়েও প্রচুর লিখেছেন।]

অনুবাদ : ড. তাসনিম আলম

চিঠিটা হাতে দিয়ে পোষ্ট অফিসের কর্মকর্তা বলে, আবেদ চাচা, আপনার নামে চিঠিটা বিদেশ থেকে এসেছে। এখান থেকে বহুদূরের একদেশ থেকে।

পথের ধারে এক গাছের ছায়ায় পাথরে বসতে বসতে নিজেকে প্রশ্ন করে, 'আমার নামে চিঠি?' আবেদ বিন মাসউদ শাবীর ষাট বছরের দীর্ঘ জীবনে বহির্বিশ্বের সাথে কখনো কোন যোগাযোগ হয়নি। কে বিদেশে বসে আমাকে স্মরণ করতে পারে, কেন লিখবে আমাকে! খাম ছিঁড়ে চিঠির ভাঁজ খুলে খুব গভীর দৃষ্টিতে সে চোখ বুলায় উপরনিচে।

প্রায় চারঘন্টা সে স্থির বসে থাকে। সূর্য তীব্র আলো ফেলে তার উপর, তবু সে একটুও নড়েনি, বাধ্য হয়ে সূর্য তাকে ছেড়ে চলে গেছে। পাশের দেয়ালের ছায়া এসে পড়েছে তার গায়ে। একসময় চিঠিটি ভাঁজ করে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে রেখে দেয়। জোর পায়ে হেঁটে চলে গ্রামের পথে।

পথে বৃদ্ধ আল মাসীর সাথে দেখা হয়। সালাম দিতেই আবেদ একটু থামে। কাছে যেয়ে মাসীর হাত ধরে তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে।

মাসী আপনি কি কল্পনা করতে পারেন, আপনার শহীদ ছেলে কিছুদিন পর ফিরে আসতে পারে? আচমকা একদিন এসে আপনার দরজায় কড়া নাড়বে আর আপনি দরজা খুলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবেন?

কসম করে বলছি, গত সাত বছরে আমি একমুহূর্তের জন্যও ছেলেকে ভুলতে পারিনি। ও আমার কল্পনায় এত জীবন্ত যে সকাল বিকাল খেতে বসে আমি তার অপেক্ষায় ডানে বায়ে তাকাই। কেউ কড়া নাড়লেই মনে হয় আমার ছেলেই আসছে হয়ত। পাশে এসে কেউ দাঁড়ালেই ভিতরটা চমকে উঠে, মনে হয় এখুনি ওর কণ্ঠ ভেসে আসবে। আহ যদি আমার প্রিয় সন্তানটি ফিরে আসত! তাকে ছাড়া আমরা যে বেঁচেও মরে আছি।

আমি সত্যিই বলছি আল মাসী।

তবে কি ভাবছেন, আমি আপনার কথা ফালতু মনে করছি। শহীদদের নিয়ে কেউ বাজে কথা বলে না, তাদের সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ।

আচ্ছা ধরেন, এখনি একটি টেলিগ্রাম এলো এই খবর নিয়ে যে আপনার ছেলে আগামীকাল আসছে। তবে কি বলবেন?

অনেক কারণই থাকতে পারে দেরীতে ফিরে আসার তবু স্বাধীনতার দুইবছর পর্যন্ত এমনটা আশা করাই যায়। কিন্তু এতবছর পর তো এটা সম্ভব নয়।

আমি যে এমনই একটি চিঠি পেয়েছি যে তারা সবাই ফিরে আসছে।

আল মাসী আর দাঁড়ানোর প্রয়োজন বোধ করল না, মনে মনে বলল, লোকটার মন খুব নরম, হয়ত এখন পাগল হবার পথে। সব মানুষ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে অথচ সে ছেলের শোকে অতীত আঁকড়ে পড়ে আছে। ছেলে ফিরে এলেও আবেদের খুব লাভ হবে না। একটি হোটেল চালানোর অনুমতি বা ট্যাক্সির লাইসেন্স পাবে বড়জোর অথবা তাকে পুরোপুরিই উপেক্ষা করা হবে। অথচ একজন শহীদের পিতা হিসেবে আমরা প্রতি চারমাস পরপর ভাতা পাই যা কখনোই ভাবিনি। ভাতা নিয়মিত না পেলেও চাষীদের যে কর্জ দেয়া হয় সেখানেও শহীদের পিতারা অগ্রাধিকার পায়। ছেলেদের জন্যেই কোর্টেও আমরা জিতে যাই বিভিন্ন মামলায়। যা গেছে তা আল্লাহর ইচ্ছাতেই গেছে। আল্লাহ শহীদদের আত্মা শান্তিতে রাখুন।

শুভ সন্ধ্যা, কুদুর।

স্বাগতম স্বাগতম চাচা আবেদ। কত সৌভাগ্য আপনি এই সন্ধ্যায় এসেছেন! আপনাকে কি একবোতল সোডা দিতে পারি।

না ঠিক আছে। অনেকদিন তোমার সাথে দেখা হয় না তাই দেখা করতে এলাম।

আল্লাহ আপনার ভালো করুন চাচা। সারাদিন-রাত তো এই পেটের ধান্ধায় থাকতে হয়। দেখেন, জীবনটা এই পানীয় বিক্রি করেই কাটছে আমাদের। যার বিনিময়ে একপাল ছেলে আর আশ্রিত আত্মীয় স্বজনের ভরনপোষণ করতে হচ্ছে।

এমনটাই আল্লাহর ইচ্ছা যে তুমি তাদের

ভরণপোষণ করাবে। আজ আমি তোমার কাছে এসেছি আমার ছেলে মোস্তাফার শাহাদাত বরণের কাহিনীটা আবার শুনতে।
সেদিন আমরা ওরাস পর্বতমালা থেকে নেমে সীমান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। গুরুত্বপূর্ণ একটা চিঠি ছিল আমার কাছে। চাঁদনী রাত। মোস্তফা আমার সামনে হাঁটছিল। বৈদ্যুতিক তারের বড় খুটিটা থেকে দেড়ঘন্টা হাঁটার পর হঠাৎ করেই সে একদম স্থির হয়ে গেল। আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে বলে, আমার পায়ের নীচে মাইন। তোমরা যে যেখানে আছ দাঁড়িয়ে থাক।
তোমাকে সাহায্য করি?
না। সেটা সম্ভব নয়। তোমরা মাটিতে শুয়ে পড় যেন বোমা তোমাদের উড়িয়ে নিয়ে না যায়।
আমি শুয়ে পড়ার সাথে সাথে বিকট বিস্ফোরণ ঘটল। মোস্তাফা দ্রুত পাশের এক গর্তে লাফ দেয় কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, ঐ গর্তেও মাইন পোঁতা ছিল। পরে আমি তার মৃতদেহ টেনে তুলি।
আল্লাহ তাকে রহম করুন, তার বুক দুইফাঁক হয়েগিয়েছিল। ঐখানেই আমরা তাকে কবর দিয়ে সামনের এগিয়ে যাই।
'তাহলে বলছ যে, তুমি তাকে কবর দিয়েছ!'
নিশ্চয়। এই দুই হাত দিয়ে তাকে কবরে শুইয়ে দিয়েছি। কত যে কেঁদেছি। আবেদ চাচা! আপনি তো জানেন, মোস্তফা আমার নিজের ভাইয়ের চেয়েও আপন ছিল।
'শোন বাবা কাদ্দুর, তুমি তবে নিশ্চিত যে তোমার গল্পটি সঠিক এবং এতে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই?'
কাদ্দুর খুবই অবাক হয় আবেদের কথায়। বলে, 'নিশ্চয়'।
কিন্তু বাবা আমার স্বপ্নও যে সত্যি। আজ ভোরে নামাজের পর দেখি মোস্তফা আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলছে, 'বাবা অলৌকিকভাবে আমি মাইন বিস্ফোরণের পরেও বেঁচে গেছি। দশদিন পর আমি ফিরে আসছি বাবা।'
'আর কিছু কি বলেছিল সে?'
'শুধু এটুকু কথাই বলেছে।'
'আল্লাহ শহীদদের প্রতি অনেক রহম করেন। আপনার ছেলে তো এখন জান্নাতুল ফেরদাউসে আছে। চাচা এবার নিশ্চিন্তে নিজের কথা ভাবুন। দেব এক গ্লাস?'
'আল্লাহ তোমার ব্যবসায় বরকত দিন।'
আবেদ বেরিয়ে গেল পিছনে হতবাক কাদ্দুসকে রেখে। একদম ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া তার মুখে খুব ধীরে ধীরে রক্ত ফিরে আসে।
'কেমন আছেন আজ আবেদ চাচা?' তরুণ আব্দুল হামীদ জানতে চায়।
'ভালোই আছি বাবা। এ গ্রামের কাউন্সিল সভাপতি ও স্কুলের প্রিন্সিপাল হিসেবে আমার একটি প্রশ্ন ছিল তোমার কাছে।'
'অনুগ্রহ করে বলুন চাচা।'
'কাউন্সিল সভাপতি হিসেবে তোমার কি মতামত, ধরো যদি এ গ্রামের সব শহীদ ফিরে আসে অথবা কেউ কেউ আসে?'
আব্দুল হামীদ দাঁতে দাঁত পিষে মনে মনে বলে, 'যদি আপনার ছেলে ফিরে আসে তো আমি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবই। ওর মাংস চিবিয়ে চিবিয়ে খাবো।'
কিন্তু উপরে উপরে মৃদ্যু হেসে জানতে চায়, 'এ কথা আসছে কেন?'
আবেদ বলতে যেয়েও থেমে গেল, মোস্তাফার কথা বলা ঠিক হবে না। কারণ ওর পিতার হত্যার সাথে সে জড়িত ছিল।
'এমনিই এমন একটি ভাবনা আমার মনে এলো। তুমি নিঃসঙ্কোচে মনের কথা প্রকাশ করবে আশা করি।'
'এর উত্তর তো খুবই সোজা। তারা মৃতদের তালিকায় নাম লিখিয়েছে, মৃত্যু পরবর্তী একটি নতুন জীবনেও প্রবেশ করেছে। তাদের পক্ষে কোনভাবেই ফিরে আসা সম্ভব নয়। আমার সময়কালে তো আসার সম্ভাবনা আদৌ দেখছি না।'
'কিন্তু এরা তো প্রকৃত যোদ্ধা ছিল। এরা তো শহীদের মর্যাদা লাভ করেছে?'
'তাতে কি?' যদি কেউ ফিরেও আসে একসপ্তাহের মধ্যেই প্রমাণ হয়ে যাবে যে তারা ভুয়া। যতই নিজেকে সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করুক মানুষ বুঝে নিবে তারা মুখোশ পরিহিত।'
'কিন্তু ওরা যদি ওদের সব অস্ত্রসহই ফিরে আসে?'
'তবে তো এটি আমার আওতার বাইরে। তখন এদের দায়িত্ব নিবে রাষ্ট্র। আইনুযায়ী এদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া কঠিন বিষয় হবে না।'
আব্দুল হামীদ আর দাঁড়ানোর প্রয়োজন বোধ করে না। এই বুড়োটা শীঘ্রই পাগল হয়ে যাবে। লোকটা তো চোখে দেখে না আবার দেখতে মোটেও ভাল না। ঘোলাটে চোখ, কুঁজো পিঠ আর বাঁকা মুখ। হাতদুটোও ঝুলে পড়া।
পথেই দাঁড়িয়ে থাকে আবেদ, আরো কুঁজো হয়ে মুখ নীচু করে।
গ্রাম্য প্রধাণ আমাকে আইন দেখায়। যোদ্ধা শহীদ হোক বা না হোক তারা মৃত। ফিরে আসলে আবার তাদের সংগ্রাম করতে হবে নিজের পরিচয় প্রমাণ করতে। গাদ্দারের ছেলের কাছে আর কি আশা করা যায়। গ্রামের সবাই এ কথা জানে অথচ নিরঙ্কুশভোটে সে-ই নির্বাচনে জয়ী হয়। যেমন সে নিজেও একে ভোট দিয়েছিল, কারণ একজন গ্রাম্যপ্রধানের ছেলে হিসেবে আর কারো চেয়ে তার অভিজ্ঞতা তো বেশি হবার কথা। আর অতীতের সকল অপরাধীকে তো আমরা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলাম, তার ফলশ্রুতিতেই এই নির্বাচন।
'আবেদ চাচা কেমন আছেন?'
'তুমি কি সাইয়েদ মানী? আমি একটু কথা বলতে চাই তোমার সাথে।'
'আমি যে ব্যাস্ত এখন। একটা মিটিং আছে এক্ষুণি। পরে কথা হবে।'
'আমি একমিনিট সময় নেব বাবা।'
'আচ্ছা বলুন।'
'তুমি কি বিশ্বাস করো যে সব শহীদরা মৃত।'
'না। তারা তো জীবিত। মহান প্রভুর সান্নিধ্যে খুবই ভালো আছে।'
'না আমি এটা বোঝাতে চাইনি। আমি বলছি, তারা কি এই পৃথিবীতেই থাকতে পারে না। এখানকার রুটি খাচ্ছে আর হাটে-বাজারেও যাচ্ছে?'
'আল্লাহ জানেন।'
'এটা এতো অনিশ্চিত নয়। শহীদরা শীঘ্রই ফিরে আসছে গ্রামে।'
'কি বলছেন? আপনি সুস্থ আছেন তো! আমার একটা জরুরী মিটিং আছে।'
'না এটা সত্যি। আমার ছেলে মোস্তফার ঘাঁটি তোমার বাড়ীতেই ছিল– তোমরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার আগে। ওরা এ সপ্তাহেই আসছে।'
জেলা সভাপতির মুখ শুকিয়ে গেল এ কথা শুনে। দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভবপর হচ্ছিল না তার পক্ষে। মনে মনে ভাবল, জানিনা কিভাবে সে এটা জানতে পেরেছিল যে, আমি শত্রুদের তার অবস্থানের কথা জানিয়েছি। আর একদল সৈন্য গোপনে আমার বাড়ীতে নজরদারীও করছিল প্রায় একমাস কিন্তু সে আসেনি। শেষে সে একটা চিঠি দিয়ে জানায়, তুমি দেশের প্রতি এক বিশ্বাসঘাতক। আমি বাধ্য হয়ে গ্রামে ফিরে আসি। এরপরেই সে আমাকে হত্যা করত কিন্তু আমার সৌভাগ্য যে একমাসের মধ্যেই সে মারা পড়ে।
খুব দ্বিধা নিয়ে সে জানতে চায়, চাচা, কোথা থেকে পেলেন এ খবর?'
'আজ ফজর নামাযের পর সে আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে বলে, আমি মারা যাইনি বাবা। অল্পদিনের মধ্যেই আমি ফিরে আসছি।'
'এটা কি শুধুই একটা স্বপ্ন নয়, চাচা?'
'জীবনে কখনো মিথ্যে স্বপ্ন দেখিনি আমি। সে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আর কয়েকজনের নামও বলেছিল আমাকে। আমার দুর্ভাগ্য যে নামগুলো মনে নেই এখন।'
'আমার নাম বলেছিল কি?'
'আমার মনে হয় বলেনি। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। একজন জেলা সভাপতি হিসেবে তোমার কি অবস্থান হবে যদি শহীদরা ফিরে আসে।'
'আমি তাদের আমাদের অর্জনগুলো দেখাব। স্বাধীনতা পরবর্তী আমরা কত সুফল ভোগ করছি, সেসব কথা শুনাব। আর অবশ্যই তাদেরকে পার্টির সদস্যপদ দিব। বিপ্লবী বাহিনীর প্রতি সব প্রতিশ্রুতিই পূর্ণ করব। দেশের প্রতি তাদের আত্মত্যাগ, বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে তাদের অনেক মর্যাদাও দিব।'

'ব্যাস এটুকুই?'
'এরচেয়ে বেশী আর কি চান। আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান।'
'কিন্তু যারা মহান, যারা অনেক মর্যাদাবান, যাদের নিয়ে আমরা গর্ব করি তাদের জন্য?'
'আমরা এসব নিয়ে পরে আরো আলোচনা করতে পারব। এখন যাই চাচা।'

উহ, দুশ্চিন্তায় ভরে যাচ্ছে আমার মন। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আবেদ ভাবে, আচ্ছা এই মানুষগুলো শহীদদের কি দৃষ্টিতে দেখে। মনে মনে কি ভাবে তাদের সম্পর্কে। ওরা কি বলে, শহীদ ভাইয়েরা তোমরা আল্লাহর অফুরন্ত রহমত পেয়েছ। বীরের মতো নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে এই দেশটাকে তোমাদের ভাইদের জন্য নিরাপদ করে গেছ। নাকি তারা ভাবে, আল্লাহ তুমি দয়ালু, আমাদের প্রতি অশেষ দয়া করেছ, তাই দুনিয়ার এত নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করোনি।
'শুভ সন্ধ্যা আবেদ চাচা।'
আবেদ সোজা লোকটির হাত ধরে থামাল। তুমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছ বাবা। তুমি ছাড়া কেউ পারবে না আমার মনোকষ্ট দুর করতে।
কি হয়েছে চাচা?!
'এ গ্রামে একমাত্র তোমাকেই আমি বিশ্বাস করি। তোমার অতীত অত্যন্ত স্বচ্ছ। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তুমি অস্ত্র হাতে লড়াই করেছ। তুমি সামান্য মূল্যে তোমার বিবেক বিক্রি করবে না। ভাইয়ের জীবনের বিনিময়ে তুমি কিছু ভোগ করতেও চাইবে না। অথবা শত নির্যাতনেও এমন মিথ্যা স্বাক্ষ্য দিবেনা যার কারণে একজন বিশ্বাসঘাতক মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় অর্জন করে। তুমি এই গ্রামের ফেরেশতা বাবা।'
আপনি বাড়িয়ে বলছেন আবেদ চাচা।
ছেলের মাথার দিব্যি দিয়ে বলছি। এটাই সত্যি বাবা।
কিন্তু আপনি কেন বলছেন যে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ।
তুমি কি জান গ্রামপ্রধান আমাকে কি বলেছে?
না তো।
যদি শহীদরা ফিরে আসে তবে তাদের জীবন দিয়ে সংগ্রাম করতে হবে মৃতদের তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে।
ও তো এক গাদ্দারের ছেলে। ওর কাছ থেকে কি আশা করা যায়।
আর জেলা সভাপতি আমাকে কি বলল জানো?
আল্লাহর ওয়াস্তে জানিনা।
'আগে তাদের তালিকাভুক্ত করে পর্যবেক্ষণ করবে তারপর সন্তুষ্ট হলে তাদের দলের সদস্য করে নিবে।'
'আবেদ চাচা আমার মনে অনেক অশান্তি এর মধ্যে আবার এ নতুন ভাবনা এলো। যা কিছু নিয়মনীতি সব জীবিতদের ভেবেই করা হয় মৃতদের কথা ভেবে নয়। আইন জীবিতদের হাতে। মৃতরা তো মৃতই। পরিচয়পত্র বা প্রমাণপত্র ছাড়া এ যুগে কোনকিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। বিপ্লবের ইতিহাস পরিচয় আছে, সংগ্রামেরও একটা পরিচয় আছে, এমনকি ভালো মানুষরও একটা পরিচয়পত্র আছে, একমাত্র গাদ্দারের কোন পরিচয়পত্র থাকে না। আমরা সবাই জানি সে গাদ্দার তবু কেন আমরা তার বিকল্প পেলাম না। কারণ এসব পরিচয়পত্র সত্যকে আড়াল করে । শেষমেষ আমলা'তন্ত্রেরই জয় হয়।'
'কিন্তু বাবা, এই পনের হাজার শহীদের মর্যাদা কি আমাদের সবকিছুর উর্দ্ধে নয়? তাদের সম্মান করতে না পারলে আমাদের সব অর্জন তো বৃথা, অর্থহীন।'
'এসব কথা কেন বলছেন চাচা?'
'ওহ তোমাকে বলতে তো ভুলেই গেছি। আমার ছেলে মোস্তফার কথা তো তোমার মনে আছে?'
'কেন মনে থাকবে না। আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দিয়ে অনেক রহম করেছেন। এই দুরাবস্থার মধ্যে তাদের পড়তে হলো না।'
'সে এ সপ্তাহেই ফিরে আসছে।'
বিপ্লবী যোদ্ধাদের সমন্বয়ক মাথা নিচু করে ভাবতে থাকে। শেখ আবেদ কি অসুস্থ? না, তাকে তো বরাবরের মতোই সুস্থ মনে হচ্ছে, তবে কি বলছেন এসব! তিনি খুব বিশ্বাসী আর নির্ভযোগ্য মানুষ। অবিবেচকের মতো কথা তিনি বলতে পারেন না। তবে মোস্তফাকে সমাধিস্থ করার বিষয়টা সত্যি গোলমেলে। বৈদ্যুতিক তারের বেড়ার কাছে সারক্ষণ সৈন্যরা টহল দেয়। দু'টো মাইন বিস্ফোরণের পরে কুদুর কিভাবে তাকে কবরে শোয়াতে পারল এমন পরিস্থিতিতে! কবর দেয়ার মতো সাহস সে সময় সে কিভাবে পেল? সে কি এতে একটুও আহত হয়নি শারিরীক বা মানসিক ভ'বে? সত্যিই মোস্তফা ফিরে আসছে নাকি এই পিতা সন্তানের মৃত্যুর ঘটনা বিস্তারিত জানার কৌতুহলের কারণে এমন কথা রটাচ্ছে। খুব খারাপ হবে যদি সে এমন ছল চাতুরীর মাধ্যমে সন্তানের মৃত্যু রহস্য অনুসন্ধান করে।
'আপনার কথার অর্থ খুব মহান চাচা।'
'মহান। হ্যাঁ খুব মূল্যবান কথা এটি।'
'তো এ খবর আপনি কোথায় শুনলেন, চাচা?'
'আমি খুব বিশ্বস্ত সূত্রেই জেনেছি বাবা।'
'কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, শহীদদের প্রত্যাবর্তন নিয়ে আলোচনা বসবে। এর বিরুদ্ধে পূর্বসতর্কতা নেয়া হবে। আমি বুঝতে পারছিনা তারা এককভাবে আসবে নাকি দল বেঁধে আসবে। কোনটা তাদের জন্য ভাল হবে।'
'তা এ জাতির ভাগ্যের উপর নির্ভর করবে।'
'আর এ জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করে এখানকার প্রশাসন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যুবরাজ আব্দুল কাদেরের কথা। সে তো মাত্র সতের বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেছিল কিন্তু গত দেড়শতাব্দী ধরে সে জীবিত আছে মানুষের মাঝে। এর এক মাত্র কারণ হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্ম তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করছে। আমার কথাই ধরুন না আমাকে দেখে কি মনে হয় না আমি বেঁচে থেকেও মৃতদেরই কাছের একজন?'
'আমার মাথা ঘুরছে, মনে হয় পড়ে যাব। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিনা। আর কথা বলো না।'
আবেদ হাঁটতে শুরু করল। পিছন থেকে খুব নম্রসুরে প্রাক্তনযোদ্ধা দলের সভাপতি তাকে বলল, 'যদি তার সঙ্গে আবার যোগাযোগ হয় তবে তাকে এ গ্রামে ফিরে না আসার পরামর্শই দিবেন। আল্লাহ পৃথিবী অনেক প্রশস্ত। তাকে বলবেন অন্য কোথাও যেন নতুন জীবন শুরু করে।'

শেখ আবেদের মাথা পাথরের মতো ভারী লাগছে। যেন বুলেটে ভর্তি তার মাথা। একটি মানুষও তাদের ফিরে আসাকে স্বাগতম জানালো না। সুবিধাবাদী বা ভালোমানুষ, বিশ্বাসঘাতক এমনকি বিপ্লবীরা পর্যন্তও। এই মানুষগুলোর কি হলো। কোন রাক্ষস এদের অনুভূতিগুলো গ্রাস করে নিল যেন এরা সবাই একটা ট্রেনের বগিতে স্থির বসে আছে অন্য বগিগুলো থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে। আরেকটি চলমান ট্রেন এসে ধাক্কা দিয়ে এ বগিকে সামনে এগিয়ে না দিলে এদের সামনে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই।
'শেখ আবেদ! তুমি কি অসুস্থ হয়ে পড়লে?
এক বিপ্লবীযোদ্ধা সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল একটা লেদারের কালো ব্রিফকেস নিয়ে। 'একটু দাঁড়াও বাবা, আমার একটু কথা ছিল।'
'আচ্ছা বলুন, যদিও আমার একটু তাড়া আছে এই শহীদ যোদ্ধাদের বিধবারা আমাদের খুব ঝামেলায় ফেলে। এক শহীদবিধবার বাড়ীতে আজ ভীষণ হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। হাতাহাতি থেকে খুনোখুনি পর্যন্ত। এই মহিলা তার বাড়িটাকে একটা বেশ্যালয় আর মদের আড্ডাখানা বানিয়েছে। অনেকবার সতর্ক করা হয়েছে তাকে তবু সে কর্ণপাত করেনি।'
এইরকম একটা বিষয় নিয়েই কথা বলতে চাই তোমার সাথে।
কি হয়েছে আবেদ সাহেব। নতুন কোন খবর আছে কি?
'তারা ফিরে আসছে।'
'তারা কারা?'
'শহীদরা।'
'খুব ভালো কথা তো।' বলেই সে আনমনা হয়ে ভাবতে শুরু করলো, এমন কেউ ফিরে আসছে না তো যে তার সম্পর্কে জানে। তবে তো সমস্যাই হবে। অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে সেদিন আমার ইউনিটের সবাই মারা পড়েছিল। কিভাবে আমি বেঁচে গেলাম কেউ সেটা জানার কথা না। শত্রুরা আমাদের দিকে গুলি করতেই আমি মেশিনগান ফেলে সোজা শত্রুদের দিকে দৌড় দেই দু'হাত তুলে। দলে আর কেউ মেশিনগান চালাতে পারত না। এক এক করে সবাই নিহত হলো।'
'যাক অন্তত একজন তাদের ফিরে আসাকে ভালোভাবে গ্রহণ করল। আবেদ মনে মনে ভাবলেন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এরাই প্রকৃত যোদ্ধা। আবার জানতে চাইলেন, বাবা তুমি ভেবে বলছ তো?'
আচ্ছা এবার আমার কথার উত্তর দিন তো চাচা। আপনি কি চান যে আল্লাহর রহমতে শহীদ হওয়া আপনার ছেলে মোস্তাফা ফিরে আসুক আর একজন শহীদপিতা হিসেবে পাওয়া আপনি সব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন? আপনি তো একজন বিপ্লবী ছিলেন। কত কষ্ট করেছেন, জেল-জুলুম সহ্য করেছেন অথচ কিছুই পাননি বিনিময়ে। কিন্তু একজন শহীদের পিতা হিসেবে কত মর্যাদা কত সুবিধা ভোগ করছেন। ভালো করে ভেবে দেখুন, শহীদরা যদি আমাদের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে যোগদান করতে পারত তবে ঠিক ছিল কিন্তু এত বছর পর তারা কোন কিছুতেই অংশ নেবার যোগ্যতা হারিয়েছে।'
কিন্তু সত্যি যদি তারা ফিরে আসে। সবাই না হোক কেউ কেউ যদি আসে?'
যদি আসে তো এটা তাদের স্ত্রীদের হাতেই ছেড়ে দেব। প্রয়োজন পড়লে তাদের বউদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করব
আবেদের মাথা আরো ভারী বোধ হল। একটা তিতাভাব তার গলা মুখ ভরিয়ে দিল চোখদুটো জ্বলছিল খুব। সরুপথ ধরে এগিয়ে গেল আবেদ।
কেউ চিন্তিত নয় যে বগিটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যেন আমরা এক কবরস্তানের পাশে বাস করছি আর গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়েছি কবর মাড়িয়ে চরে বেড়াতে। ভুলেই গেছি এটি একটি কবরস্তান যেখানে আমাদের মতোই মানুষেরা শুয়ে আছে। যারা জীবিতকালে আমাদের খুব প্রিয়জনই ছিল। ওহ, ক্ষুদায় মরে যাচ্ছি। আজ তো কিছুই খাওয়া হয়নি সকাল থেকে। এই শহীদদের ফিরে আসার কথা হচ্ছে অথচ কেউ তাদের নায্য অধিকারের কথা ভাবছে না। যদি এরা যুদ্ধক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় জীবন না দিত তবে আজ তো আমাদের বেঁচে থাকার কথা ছিল না। তাদের জন্যই আমরা আজ স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করছি।
ও আল্লাহ, যদি শহীদরা ফিরে এসে এ সত্যের মুখোমুখি হয় তবে কি তারা তাদের আত্মত্যাগের জন্য অনুতপ্ত হবে না? পরবর্তী প্রজন্ম যদি এই বাস্তবতাটা উপলব্ধি করে তবে কি তারা আর আগ্রহী হবে এমন ত্যাগ স্বীকার করতে?
ওহ, আমার মাথা বুক পেট পা সব ব্যাথায় কুঁকড়িয়ে যাচ্ছে
'আল্লাহ আপনাকে ভালো রাখুন, চাচা।'
আবেদ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে চায় কে কথা বলে। লোকটির হাত ধরে বলেন, 'একটু দাঁড়াও বাবা। একটি কথা আছে আমার।'
বলুন।
যদি তারা ফিরেই আসে তবে কোষাগারের অবস্থা কি হবে?
কারা ফিরে আসবে?
শহীদরা ফিরে আসছে। যাদের পরিবার ভাতা পাচ্ছে।
কিন্তু এটা তো অসম্ভব কথা বলছেন চাচা।
আমি খুব বিশ্বস্ত সূত্রেই এ কথা জেনেছি বাবা। সবাই না হলেও অনেকেই ফিরে আসছে এ গ্রামে খুব অল্পদিনের মধ্যেই। এটা নিয়ে আর বাদানুবাদ করো না আমার সঙ্গে। কোষাধ্যক্ষ হিসেবে যদি সম্ভব হয় তবে শুধু এটুকুই জানাও এ ভাতার কি হবে
এটা কেউ বিশ্বাস করবে না বা মেনে নেবে না। তবু যদি কেউ এমন দাবী নিয়ে আসে তো তাকে আদালতে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। আর আদালত তো একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলে, এ জন্য বহু বছর লেগে যাবে। তারপরও যদি তা প্রমাণ হয় তবেই আমরা ভাতা দেয়া বন্ধ করব।
'আর যে টাকাগুলো এতদিন দেয়া হলো?'
হুম। আপনি তো আমাকে দ্বিধায় ফেলে দিলেন। তবে আইনমতে এটা পরিষ্কার যে, টাকাগুলো অপ্রয়োজনে ব্যয় হয়েছে। তাই কোষাগার এটা ন্যায়সঙ্গত ভাবেই ফিরিয়ে দেয়ার দাবী করতে পারে। আর সচেতন মানুষরা তো বিনাবাক্যব্যয়ে এ অর্থ ফিরিয়ে দেবে অন্তত তার পরবর্তী প্রজন্মের কথা ভেবে।
'কিন্তু শহীদ না হোক যোদ্ধা হিসেবেও তা তার কিছু পাওনা আছে দশের কাছে?'
এরকম সুবিধা পাবার জন্য স্বাধীনতার পর পরই তাদের দরখাস্ত করতে হতো। এখন তো এমন সুবিধা পাওয়া সম্ভবপর নয়। ভেবে দেখুন, এ সমাজ, সমাজপতিদের নিজেদের আত্মীয়স্বজন আছে, নিজস্ব লোক আছে তারা তো এদের অস্বীকার বা উপেক্ষা করবে। তাদের ভণ্ড ভেবে আইনগত ব্যবস্থা নেবে। মোটকথা তাদের প্রতি অনেকপ্রর্ব্যবহার করা হবে। ফলে তাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষেরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হবে।
তারা সবাই আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষ বাবা। তারা আমাদের ভীষণ গর্বের, অহংকারের। হ্যাঁ চাচা। তারা কেউই কবর থেকে বেরিয়ে এসে সৌভাগ্যবান হবে না।
খুবই বিরক্ত হয়ে শেখ আবেদ রাস্তা ছেড়ে গ্রামের মধ্যস্থানের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'আবেদ বাবা, কোন সমস্যায় পড়েছেন মনে হয়?'
ওহ তুমি। আমাদের কম্যুনিস্ট?
'ঐ আমল আর নেই বাবা। এখন আমি রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের দায়িত্বে আছি। আপনার কি মনে আছে ঐ অফিসার আমাদের নির্যাতন করার সময় কি বলত?'
আমার মনে আছে। সে তো আমাদের চেয়ে তোমাকেই বেশী নির্যাতন করেছে। তোমাকে মেরে ফেলাই ওর উদ্দেশ্য ছিল।
ঐ অফিসার আমাকে পার্টি আর ইউনিয়ন থেকে বহিস্কার করতে চেয়েছিল। এখনও তার কথা আমার কানে বাজে, 'এ আন্দোলনের মধ্যে সবচেয়ে বিষাক্ত জীবানু এটা।'

হ্যাঁ। তবে এখন আমি তোমার কাছে জানতে চাই, যদি শহীদরা ফিরে আসে!
সব শহীদ...?
নিশ্চয়।
তবে তো জনসংখ্যা বাড়বে আর সামাজিক

সমস্যাও প্রকট হবে।
আমি এই দৃষ্টিতে দেখছিনা ব্যাপারটা। শুধু বলো তুমি এদের মেনে নিবে কি নেবে না।
একভাবে হয়তো তাদের মেনে নেয়া যায়। তাদের ট্রেনিং সেন্টারে রাখতে হবে অস্ত্র ছাড়া। বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগহীন্র অবস্থায় তাদের প্রশিক্ষণ চলবে। তারপর অফিসারদের এক এক করে বিভিন্ন ফার্মে ম্যানেজারের দায়িত্ব দেয়া হবে। তাদের জন্য লোন নেয়া খুব সহজ করা হবে। সাধারণ সৈন্যদের মত তাদের কর্মক্ষমতা অনুযায়ী কাজ দেয়া হবে।
'তুমি মহান বাবা। দারুণ কথা বলেছ।'
'তবে আপনি তো আমার ব্যক্তিগত মত জানতে চাননি। আমরা কি করতে পারি সেটা শুনতে চাইলেন।
তো তোমার ব্যাক্তিগত মতটা এবার বলো।
আমি তো প্রথমেই তাদের নিয়ে মন্তব্য করতে পারিনা। আমি আগে দেখব তারা কি উদ্দেশ্য নিয়ে ফিরে এসেছে। ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত আমি বাবা। পরিস্থিতি অনেক ঘোলাটে হয়ে উঠতে পারে। কোন পক্ষালম্বন করা তখন জটিল হতে পারে আমাদের জন্য।
স্থানীয় ইউনিয়ন প্রধানকে ধন্যবাদ দিয়ে আবেদ এগিয়েগেলেন আরো চিন্তিত হয়ে। 'একজন প্রকৃত বিপপ্লবী' মনে মনে ভাবলেন। আমি তাকে অনড় অবিচল দেখেছি অমানুষিক নির্যাতনের সময়। এখন সে মোটেও আগ্রহী নয় তাদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে। সে কি সন্দেহ করছে যে শহীদরা তার কাজকে সমর্থন দিবে না। আল্লাহু আকবার! আল্লাহ মহান! জানিনা তারা কি ভাবনা চিন্তা নিয়ে ফিরে আসছে আর কি ভেবেই বা চলে গিয়েছিল। কিসের জন্যই বা তারা প্রাণ দিয়েছিল। আমরা যদি এই বিশ্বাসঘাতক আর সুবিধাবাদীদের ফাঁদেই আটকে থাকি আর এই বস্তুবাদী জীবনে ডুবে যাই, যদি ভুলে যাই যে মূল ট্রেন থেকে আমাদের বগি একেবারেই বিচ্ছিন্ন, যে ট্রেনে আমাদের প্রিয়মানুষগুলো ছিল, শুধু প্রিয়ই নয় তারাই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে খাঁটি মানুষ। ওরা আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছে, কারণ জাগতিক লোভ লালসা ওদের নষ্ট করতে পারেনি। ওদের ঐ ট্রেন পিছন থেকে এসে আমাদের বগিটাকে সামনে এগিয়ে দিতে পারে আবার বিপরীত দিক থেকে এসে এ বগিটাকে পিছনেও ঠেলতে পারে। আল্লাহু আকবার।
বাবা, কি হয়েছে আপনার? আবেদের ছেলে হাতের উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে রাস্তার মোড়ে।
তুমি কোথা থেকে এলে?
বাড়ি থেকেই এসেছি। সকাল থেকে খুঁজছি আপনাকে। কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?
এত খোঁজাখুঁজি করছ কেন। আচ্ছা তোমার ভাই মোস্তাফা যদি ফিরে আসে কিভাবে নেবে তুমি?
'মোস্তাফা ভাই ফিরবে?!
ফিরবে নয় ফিরছে। আর তা এই সপ্তাহেই।
এসব কি কথা বলছেন!
আমার চোখের সামনে থেকে বিদায় হও।
তোমাদের কোন দোষ নেই। এটা আমার দোষ। আমাদের সবার দোষ। যাও তোমার মা, বৌ আর বাচ্চাদের খবরটা দাও। ছেলের কাঁধে হাত রেখে বললেন, আমি মসজিদের ইমামের সঙ্গে একটু কথা বলে আসি। তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানীমানুষ।
শেখ আবেদ সোজা মসজিদে গেলেন। ইমাম সাহেব তখন আসরের নামাজ শেষ করলেন। আবেদ কাছে যেতেই জানতে চাইলেন, আমাদের সঙ্গে নামাজ পড়লেন না কেন?
আমার ওজু নেই এখন। আমি শুধু আপনার নিরপেক্ষ মতামতটা জানতে এসেছি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে। জানেন নিশ্চয় আমার ছেলে মোস্তাফা যুদ্ধ শেষে আর ফিরে আসেনি।
হ্যাঁ সে শহীদ হয়েছে।
সে বিয়ের মাত্র চার মাস পর যুদ্ধে গিয়েছিল। তার শাহাদাতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত তার বৌ আমাদের বাড়ীতেই ছিল।
তারপর?
আমি আমার ছোটছেলের সাথে তাকে বিয়ে দেই। আর তাদের এখন চারটি সন্তান।
এমন কেন করেছেন আপনি? এটা তো প্রকাশ্য পাপ। ব্যভিচার।
এ কি বলছেন আপনি?
তা নয় তো কি। একজন বিবাহিত মেয়েকে তালাক ছাড়া কিভাবে বিয়ে দিলেন?
কিন্তু তার স্বামী তো মৃত। আমরা তার ডেথ সার্টিফিকেট পেয়েছি। ওদের বিয়ে রেজিস্ট্রিও করা হয়েছ।
এ টা তো অবাধ্যতা, আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও পবিত্র কুরআনের প্রতি অবাধ্যতা। আপনি কি জানেন না, আপনার ছেলে শহীদ। আর শহীদরা জীবিত থাকে। সে মহান আল্লাহর কাছে বসবাস করছে। এ আয়াত গ্রামের দেয়ালে দেয়ালে শোভা পাচ্ছে। দেখেননি তা? এদের ডেথ সার্টিফিকেট দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে অর্থহীন। শহীদের স্ত্রী তালাক ছাড়া আরেকটি বিয়ে করতে পারবে না। এদের কোন ছাড় দেয়া যাবেনা।
তবে কি করতে হবে হুজুর?
ধর্মীয় বিধান মতে শাস্তি পেতে হবে তাদের।
এটা করতেই হবে?
যদি তার স্বামী তাকে তালাক দেয় বা স্ত্রীকে ফিরে এসে গ্রহণ করে নেয় তবে শাস্তি পেতে হবে না। সব ধর্মেই শহীদকে জীবিত বলা হয়েছে জানেন তো। ওদের মতে যীশু শহীদ বলেই তার ফিরে আসার অপেক্ষা করছে।
তবে এক্ষেত্রে তালাক নিয়ে নেয়াই সহজসাধ্য বলে আমি মনে করি।
কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব?
প্রথম স্বামীটি বা আমার শহীদ ছেলে মোস্তাফা এই সপ্তাহেই আসছে।
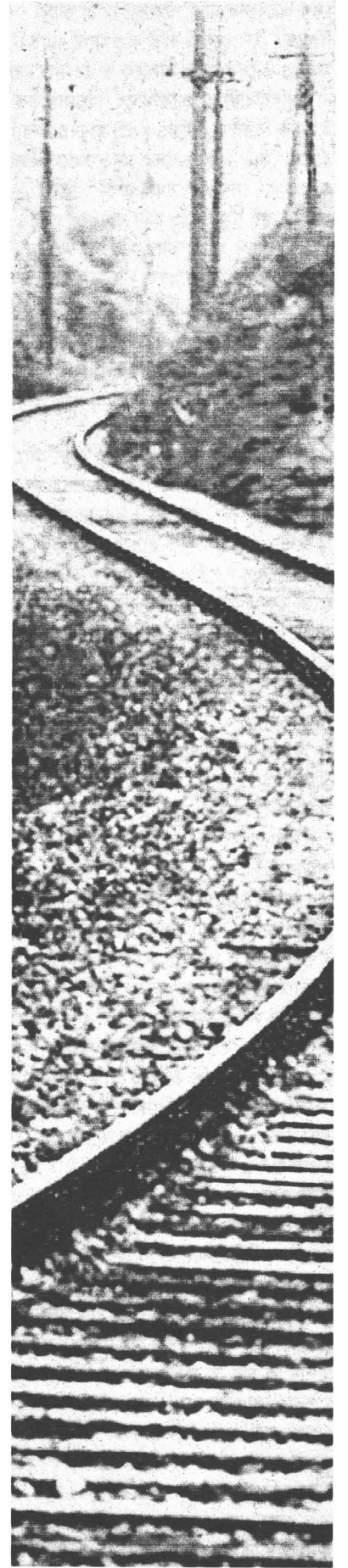
আপনি আবার গুনাহের কাজ করছেন?
কিন্তু..শুনুন..
আপনি কি আপনার ছেলেকে যীশু বা মাহদী ভাবছেন? আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন আপনি কিন্তু কবীরা গুনাহ করছেন। ইবাদী বিধান মতে আপনি চির জাহান্নামী হবেন। কবীরা গুনাহকারীর তাওবা কিন্তু কবুল হবে না। এক্ষুণি এ মসজিদে থেকে বেরিয়ে যান, আপনি মহাপাপী। যান অন্য কোন মাজহাবে যোগ দিয়ে তাওবা করুন।
লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে মসজিদ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন শেখ আবেদ। গ্রামের যে প্রান্তে রেললাইন সেদিকে হাঁটা দিলেন।
জেলা সভাপতি মিটিং শুরু করলেন। আজ খুব ভয়াবহ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা মিটিং-এ বসেছি। খুব বড় একটি ষড়যন্ত্র হচ্ছে আমাদের গ্রামটি নিয়ে। হয়তো এক এক করে সব গ্রামেই এটা ছড়িয়ে পড়বে। আমি নিশ্চিত যে এটা বহিশত্রুর সাহায্যে হতে যাচ্ছে। এ ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত একজনকে ইতোমধ্যেই সনাক্ত করা গেছে যিনি বিদেশী ব্যক্তিদের সাহয্যে তার কার্যক্রম শুরু করেছেন। আজই তিনি একটি চিঠি পেয়েছেন বিদেশ থেকে। তিনি রটিয়ে বেড়াচ্ছেন যে নিস্পাপ শহীদরা যাদের আল্লাহ তার দরবারে তুলে নিয়েছেন তারা নাকি শীঘ্র ফিরে আসছে। আর তাদের এ প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বিষয়গুলো আমরা ঠিকমতো করতে পারছিনা তা যথাযথভাবে সম্পাদন করা। এ সমাজ সংস্কার করা এবং অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করা। একবার চিন্তা করে দেখুন, এরা কারা, প্রায় পনের হাজার সশস্ত্র সৈন্য যারা আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সবদিক থেকেই। ওরা একদম পাল্টে দিবে বর্তমানকে। উলট পালট করে দিবে সবকিছু। যদিও শহীদদের ফিরে আসা একেবারেই অসম্ভব তবু কে জানে হয়ত পর্বতমালায় কোন বিদ্রোহী দল অবস্থান করছে। অথব সত্যি সত্যিই বিদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক সৈন্য আসছে আমাদের দেশটাকে আবার দখল করতে।
৫৪সালের এক বিপ্লবী নেতা হিসেবে বর্তমান প্রশাসনের এক দায়িত্বশীল হিসেবে আমার কর্তব্য এ ব্যাপারে জরুরী পদক্ষেপ নেয়া। এ মিটিং এ আমরা মিলিত হয়েছি এ ব্যাপারে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা যায় সেটা ঠিক করতে, যেন অঙ্কুরেই এ ষড়যন্ত্র বিনাশ করা যায়। আমরা অতিসত্বর আটক করব শেখ আবেদকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। তারপরেই আমরা উচ্চপর্যায়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করব
আমি সম্পূর্ণ একমত এ ব্যাপারে। আজ তার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছিল। এমনই কিছু বিভ্রান্তিকর কথা বলছিল। আমি প্রথমে তাকে উম্মাদ বলেই ধরলাম, কিন্তু পরে বুঝলাম, লোকটা পরিকল্পনাকারীদের অন্যতম। সে বুঝে শুনেই এমন প্রশ্ন করছিল।
নারী সংগঠনের নেত্রী বলে উঠল, যদি আপনারা শুনতেন মহিলারা ঘরে ঘরে কি নিয়ে কথা বলছে। ওরা দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগছে। বিপ্লবী যোদ্ধারা বিপুল অস্ত্র নিয়ে ফিরে আসছে। গ্রেনেড বোমা, তরবারী, মেশিনগান যত রকম আগ্নেয়াস্ত্র আছে আর কি। ওরা বেশকিছুসংখ্যক মানুষকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে আসছে। এর অর্থ তারা আত্মরক্ষার সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিয়েই আসছে যেন নির্বিঘ্নে মিশন শেষ করে তারা আবার প্রভুর সান্নিধ্যে ফিরে যেতে পারে।
জেলা সভাপতি আবার সতর্ক করে বলল, আমি বলছি তো ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
যুবসংগঠনের প্রধান বলল, আমি কিন্তু এ পরিস্থিতিতে যুবকদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব না। ওরা বিদেশের ব্যাপারে বেশ আগ্রহী। বিদেশী ধ্যান ধারণায় বলিয়ান হয়ে ওরা বেশ সমালোচনা শুরু করে দিয়েছে বর্তমান সরকারের। ওরা শহীদদের সাথেই যোগ দিবে না হলে এমন ডামাডোলে নিজেরাই হয়ত বিদ্রোহ করে বসবে। ভাই মানী এমন পরিস্থিতে মিটিং করে আপনি বিচক্ষণতার কাজ করেছেন। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।
এসব ফালতু গুজবে আমরা প্রভাবিত হব না। স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে যারা সারা গ্রামে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। কোন নতুন মুখ দেখলে বা সন্দেহজনক কার্যক্রম হলে তারা রিপোর্ট করবে। এ পর্যন্ত বলে জেলা সভাপতি দৃষ্টি দিলেন প্রাক্তন যোদ্ধা দলের সভাপতি ও স্থানীয় ইউনিয়ন সভাপতির দিকে। তারা নিশ্চুপ তবে তাদের মতামতটা জানা জরুরী।
ব্যাপারটা সন্দেহজনক নিঃসন্দেহে তবে শেখ আবেদ সরল সোজা মানুষ। হারানো ছেলের স্মিৃতি তিনি ভুলতে পারেননি। লোকটি খুব অসুস্থও এখন। সব মিলিয়ে বলা যায়, এটি তার কল্পনা যে তার ছেলে এই সপ্তাহেই ফিরে আসছে। যোদ্ধা দলের প্রধানকে থামিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে কাউন্সিল প্রধান, তবে তিনি যে বলছেন সব শহীদরাই নাকি ফিরে আসছে আর তার বিদেশের চিঠিটার মানেই বা কি?
জেলা সভাপতি বলে, তবে আমরা বলতেই পারি প্রাক্তন যোদ্ধারা বা তাদের প্রধান এই ষড়যন্ত্রের সাথে সরাসরি জড়িত।
এসব কি বলছেন আপনি?
ঠিকই বলছি। উঁচু গলায় কথা বলবেন না, আমরা আর এক মুহূর্ত সময়ও আপনাকে দিব না। আচ্ছা এবার দেখি শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি কি বলে।
সবাই জানে শ্রমিকরা এসব বিষয়ে আগ্রহী নয়। তবু মনে হয় শেখ আবেদ অসুস্থ মানুষ। হয়তো সত্যি তার ছেলে বিদেশ থেকে চিঠি লিখেছে। আহত যোদ্ধা হিসেবে হয়ত কোনভাবে বিদেশে যাবার সুযোগ পেয়েছে, স্মৃতিশক্তি এতদিন নষ্ট ছিল। পরে নিশ্চয় তার সব মনে পড়েছে আর চিঠি লিখেছে। যুদ্ধের পর কিন্তু এসব অবাস্তব কোন ঘটনা নয়।
ওহ তুমিও তবে বিদেশীদের দালাল। এক্ষুণি এ শ্রমিক নেতা, যোদ্ধা দলের সভাপতি ও আবেদকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করতে হবে আইন শৃংখলা বাহিনীকে।
শ্রমিক নেতা জোর প্রতিবাদ করে, আপনি যতটা কল্পনা করছেন বিষয়টা মোটেও অত গুরুত্বপূর্ণ নয়। শেখ আবেদ যে গুরুতর অসুস্থ এতে কারো সন্দেহ নেই।
নারীনেত্রী খোঁচা মারে, তবে যে নারীদের এত কানাঘুষো, উদ্বেগ এসবই এমনি এমনি?
পুলিশ প্রধান বলে, ম্যাম আয়েশা। আপনি তো জানেন গ্রামে ভয়াবহ আকারে গুজব ছড়িয়ে পড়ে একটুতেই। তবে উদ্বেগের যথেষ্ঠ কারণ আছে কারণ আজ সন্ধ্যাতেই তিনজন নিহত হয়েছে। এক শহীদের বৌ, আর দু'জন তরুণী ষোল সতের বছর বয়সের।
ঐ তিনজনকেও আমাদের গ্রেফতার করতে হবে।
ব্যাপারটি খুব ভয়াবহতার দিকে মোড় নিচ্ছে। গ্রাম্য প্রধান উদ্বিগ্ন হয়। আমি আজকেই জেলা কমান্ডারকে জানাচ্ছি। প্রয়োজনে গভর্নরকেও এটা জানাতে হবে।
স্থানীয় কমান্ডার জানায়, এই মুহূর্তে শেখ আবেদকে প্রেফতার করে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করব ঐ চিঠিটি সম্পর্কে।
ঠিক আছে, আপনি এখুনি কাজ শুরু করুন। আমরা হেডকোয়ার্টারে অপেক্ষায় থাকব আপনার সংবাদের জন্য। মিটিং আপাতত এখানেই সমাপ্ত। জেলা প্রশাসক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান।
কমান্ডার সদলবলে রওনা দেয় আবেদের বাড়ীর দিকে, কিন্তু রাস্তায় মানুষের ছুটাছুটি দেখে অবাক হয়। ছেলে বৃদ্ধ নারী পুরুষ সবাই ছুটছে রেললাইনের দিকে। সবার মুখে এক নাম শেখ আবেদ! শেখ আবেদ!
কমান্ডারও ছুটল সেদিকে। রেললাইনের পাশে সৈন্যরা শেখ আবেদের মৃতদেহ ঘিরে রেখেছে। দলে দলে মানুষ ভীড় করছে। লোকটি ট্রেনের সামনে লাফিয়ে পড়েছিল। ড্রাইভার জানাল।
কেউ কেউ তাকে একটি চিঠি হাতে নিয়ে নাড়াতে দেখেছে। কমান্ডার এক সৈন্যের হাত থেকে চিঠিটি নেয়। বিস্মিত হয়ে পড়ে, শেখ আবেদের কথাই তো ঠিক। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার।

অনুবাদক পরিচিতি : **অনুবাদক ও গবেষক**

পূর্ব প্রকাশের পর

তাজুদ্দীনকে উজাইনের রাজা সুলাহদির সামনে হাজির করা হলো। এ সময় সুলাহদি এক উঁচু রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তার ডান দিকে তার ছোট ভাই লক্ষ্মণ, অতঃপর তার জ্যৈষ্ঠপুত্র ভূপুত, অতঃপর দ্বিতীয়পুত্র পুরানমল, অতঃপর তৃতীয় পুত্র লছমন দাস এবং তারপর তার চতুর্থ পুত্র মঙ্গলরাজ তাদের আসেন বসেছিল। আর বাম দিকে রাণী দুর্গাবতী, অতঃপর তাদের একমাত্র রাজকুমারী খুব সুন্দরী সকলের প্রিয় আন্নাবতী। রাজ্যের অন্যান্য লোক তাদের নিজ নিজ স্তর অনুযায়ী আসন গ্রহণ করে বসেছিল।

তাজুদ্দীনকে রাজা সুলাহদির সামনে হাজির করা হলে সে উপস্থিত সবাইকে পরখ করে নিল। তার গভীর দৃষ্টি রাজকুমারী আন্নাবতীর উপর গিয়ে স্থির হয়ে গেল।

আন্নাবতীর উপচেপড়া যৌবনান্মাদনা প্রকৃতির নেশাতুর আলোয় ভরা চাঁদের মতো। এমনই সুন্দর যেন তার সৌন্দর্য পাথরের বুকেও আলোর বন্যার মতো মিলে একাকার হয়ে যাবে। তার গোলাপী গণ্ডদেশ তাকে আরও কমনীয় করে তুলেছে। তার চাঁদমুখ তাকে আরও আকর্ষণীয় করে রেখেছে।

রাজকুমারী আন্নাবতীর দিকে তাজুদ্দীন তাকিয়েছিল। রাজা সুলাহদির ডাকে সে চমকে উঠে। আমার নকিব আমাকে বলেছে, তোমার নাম তাজুদ্দীন। সে এটাও জানিয়েছে যে, তুমি মুসলমান এবং তুমি আমার কাছে কাজের জন্য এসেছ। তুমি সুলতান বাহাদুর খানের রাজ্যের অধিবাসী। বল, কী তোমার উদ্দেশ্য? তোমাদের সুলতানের কাছে না গিয়ে আমার কাছেই বা তুমি এলে কেন? সত্য বলবে। মিথ্যা বললে মারা পড়বে।

তাজুদ্দীন রাজা সুলাহদির দিকে তাকাল অতঃপর বলল, আমি মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত নই। আমি আহমাদনগরের অধিবাসী। কর্মকারের পেশাও জানি আমি। তরবারি চালনাবিদ্যাও জানা আছে। সেখানে আমার মা-বাবাকে খুন করা হয়েছে। আমি সুলতানের কাছে এর নালিশ-ফরিয়াদ করেছি। তিনি আমার নালিশে কান দেননি। আমি নিরাশ হয়ে পড়ি। এরপর কাজের অন্বেষণে এবং বাকী জীবন কাটানোর জন্য আমি আপনার রাজধানীমুখী হলাম। বহুলোকের কাছে আপনার মহানুভবতা ও বদান্যতার কথা শুনেছি।

তাজুদ্দীন রাজা সুলাহদিকে ফোলানোর জন্য এভাবে প্রশংসা করল, যাতে তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়।

তাজুদ্দীন চুপ করলে রাজা সুলাহদি কিছুক্ষণ মুচকি হাসলেন। অতঃপর হাতের ইশারায় তাকে কাছে ডাকলেন। তাজুদ্দীন এগিয়ে গেল। একেবারে রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রাজা সুলাহদি তাজুদ্দীনকে বললেন, তোমার ডান হাত সামনে বাড়াও।

তাজুদ্দীন নির্ভয়ে তার ডান হাত এগিয়ে দিল। রাজা সুলাহদি আঙুল দিয়ে তাজুদ্দীনের শিরা চেপে ধরলেন। বেশ কিছু সময় নিয়ে তার শিরা পরখ করলেন। অতঃপর তার চেহারায় হাসির ঝিলিক দেখা গেল। তিনি বললেন, যাও, তোমার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও।

তাজুদ্দীন পেছন ঘুরে যেখানে পূর্বে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। কক্ষের মধ্যে রাজা সুলাহদির কণ্ঠ গর্জে উঠল তোমাকে আমার ধার্মিক, সৎ ও ঈমানদার মনে হয়েছে। কেননা তোমার দেহে কোন পেরেশানি নেই। তোমার শিরা স্বাভাবিক গতিতেই চলছে। তুমি এক মেয়ের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে পালিয়ে যেতে সুযোগ করে দিয়েছ, যাকে আমার পুত্র লছমন দাস নিজের জন্য পছন্দ করেছিল। এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আবার তুমি সামনে হাজির হয়ে ঈমানদারি প্রকাশ করে কাজের জন্য আবেদনও করেছ। আমি তোমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করব না। তোমার আকার-আকৃতি ও দৈহিক গঠন দেখে তোমাকে বেশ শক্তিশালী লাগছে। তুমি বলেছ যে, তোমার কর্মকারের পেশাও জানা আছে। তুমি তোমার কোমরে একটি নতুন ও খুব সুন্দর কোমরবন্ধও বেঁধে রেখেছ। যেখানে তরবারি ও খঞ্জর রাখা আছে। আচ্ছা, তুমি তরবারি চালনা কেমন পার?

তাজুদ্দীন গভীর ধ্যানের সাথে রাজা সুলাহদির দিকে তাকিয়ে বলল, আমি আপনার লশকরে ঢোকার জন্য এসেছি। আপনি আমার তরবারি চালনার পরীক্ষা নিতে পারেন।

তাজুদ্দীনের এ কথায় রাজকুমারী আন্নাবতী চমকে উঠল। পিতাকে লক্ষ্য করে কিছু বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই রাজা সুলাহদি তাজুদ্দীনকে লক্ষ্য করে বললেন-

তুমি ঠিক বলেছ। সেটাই করা হোক। আমি তোমার তরবারি চালনার পরীক্ষা নেব। তবে একটি কথা মন দিয়ে শোন, যদি তরবারি চালানোর পরীক্ষায় তুমি হেরে যাও, তাহলে ঐ মেয়েকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য তোমাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। আর যদি জিতে যাও, তাহলে ক্ষমা পেয়ে যাবে। তবে কোন ধরনের কাজে তোমাকে নিযুক্ত করা হবে, তা আমার পুত্র তার বোন রাজকুমারী আন্নাবতীর সাথে সলাপরামর্শ করে ঠিক করবে। এখন বল, তুমি এতে রাজী তো?

তাজুদ্দীন বুকটান করে বলল, রাজা মহাশয়, আমি আপনার সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করছি।

রাজা সুলাহদির চেহারায় হাসির ঝিলিক দেখা গেল। তিনি তার এক সালারকে লক্ষ্য করে বললেন-

প্রতাপ রায়, তার সামনে একটু আস। আমি চাই, তরবারি চালানোর পরীক্ষায় তুমিই তার প্রতিপক্ষ হও। তার সাথে মোকাবেলা করো।

অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত এক হৃষ্টপুষ্ট দীর্ঘদেহী নওজোয়ান তার স্থান থেকে উঠে তাজুদ্দীনের সামনে এসে দাঁড়াল। তাজুদ্দীনকে রাজা সুলাহদি পুনরায় বললেন-

তাজুদ্দীন, আমার এখানে এ এক সেরা তরবারি চালনাকারী। এর নাম প্রতাপ রায়। রাজপুত সে। সে মুহূর্তের মধ্যে বড় বড়

বাহাদুরকে তরবারি চালিয়ে কুপোকাত করে দেয়। যদি তুমি তার কাছে হেরে যাও, তাহলে তুমি যে অপরাধ করেছ, তার জন্য অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে। আর যদি জিতে যাও, তাহলে তোমাকে কী কাজ দেওয়া হবে, তা ঠিক করবে আমার পুত্র।

কিছুক্ষণ থেমে রাজা উভয়কে বললেন-

তোমরা নিজেদের ঢাল-তরবারি সামলে নাও। আমি যখন হাত শূন্যে উঠাব, তখন মোকাবেলা শুরু করবে।

তাজুদ্দীন কয়েক কদম পিছে হটে গেল। নিজের ঢাল-তরবারি সামলে নিল। প্রতাপ রায়ও তাই করল। রাজা সুলাহদি শূন্যে হাত উঠানোমাত্রই তাজুদ্দীন ক্ষুধার্ত বাঘের মতো প্রতাপ রায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্রতাপ রায় তাজুদ্দীনের আক্রমণ ঢাল দিয়ে প্রতিহত করল। এরপর বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। বলল-

আজনবি, এতো তেজ দেখিয়ো না। এ মোকাবেলা দীর্ঘ হতে পারে। দীর্ঘ সময় ধরে তোমার প্রতিটি পশমের গোড়ায় আমার শক্তির ঝড় বইয়ে দেব।

তাজুদ্দীন প্রতাপ রায়ের চোখে চোখ রেখে রাগতস্বরে বলে উঠল-

এ ধরনের কথা বলে তুমি যদি আমাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাও, তাহলে জেনে রাখো, এক্ষেত্রে তুমি ব্যর্থ হবে।

প্রতাপ রায় তাজুদ্দীনের ঢাল হতে নিজের তরবারি পৃথক করল। অতঃপর উভয়ে একে অপরের উপর আক্রমণ শুরু করল।

কয়েকবার তাজুদ্দীনের উপর ক্ষিপ্র আক্রমণের পর একবার যখন তাজুদ্দীনের ঢালের সাথে তরবারি টক্কর খেল, তখন প্রতাপ রায় বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, কেমন হলো আমার আক্রমণ?

তাজুদ্দীন মুচকি হেসে বলল-

প্রতাপ রায়, যদি তুমি এটা ভেবে থাকো যে, তুমি রাজপুত- আর এ কারণেই তুমি তরবারি চালনায় আমার উপর জয়ী হবে, তাহলে বলতে হয় তুমি ধোকার মধ্যে আছ। মনে রেখো, আমি তরবারি চালনা ছাড়া কর্মকারের কাজও জানি। যখন আমি তোমার উপর হাতুড়ির মতো আক্রমণ চালাব, তখন তোমার সমস্ত অভিজ্ঞতা ও তরবারি চালনার সকল কৌশল ছিন্নভিন্ন করে দেব। এ কথা মাথায় গেঁথে রাখো, তরবারি চালনাকারী ছাড়া আমি কর্মকারও। আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, অচিরেই আমার আক্রমণের সামনে তুমি নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে।

এরপর আবার একে অপরের উপর তীব্র আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। তাজুদ্দীন তার আক্রমণে আগেরটার চেয়ে আরও বেশী তীব্রতা আনল। সুযোগ মতো কয়েকবার তাজুদ্দীনের ঢালের সাথে তরবারি টক্কর লাগানোর পর প্রতাপ রায় তাকে লক্ষ্য করে কিছু বলতে চাইল। কিন্তু তাজুদ্দীন তাকে এমনটি করার সুযোগ দিল না। বরং তার উপর তীব্র আক্রমণ করে তাকে বলল-

আমি তোমার চালাকি ধরে ফেলেছি। তুমি বারবার আমার ঢালে তোমার তরবারি টক্কর লাগানোর পর আমার সাথে কথা বলছ। এ সময় কথা বলার নাম করে তুমি মূলত দম নিচ্ছ এবং কথার মাধ্যমে আমাকে আঘাত করছ। কিন্তু তুমি আর সে সুযোগ পাচ্ছ না। আমি তোমাকে দম নিতেও দেব না, কথার মাধ্যমে আঘাত করতেও দেব না। ঝড়ের মাঝে যেভাবে ধুলাবালি ও খড়কুটা উড়ে, আমি তোমার অবস্থা তেমন করে ছাড়ব।

এরপর তাজুদ্দীন তার হামলায় আগের তুলনায় আরও বেশী ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল।
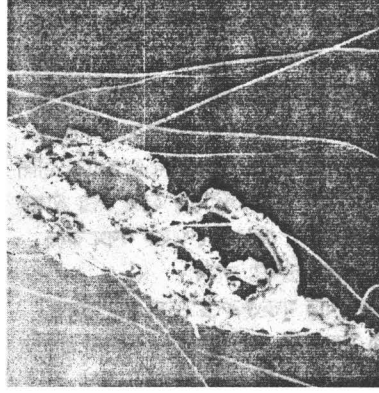
কিছুক্ষণ উভয়ে একে অপরের উপর আক্রমণ চালাল। এক পর্যায়ে প্রতাপ রায় ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে লাগল। তার এ অবস্থা দেখে তাজুদ্দীন মুচকি হেসে বলল-

প্রতাপ রায়, তুমি তো বেশ কাঁপছ। আমার শক্তি প্রদর্শন তো কেবল শুরু। তোমার জন্য ভাগ্যের পদদলিত রাস্তাকে কেবল মজবুত করতে শুরু করেছি। এবার তোমার ধারণা পাল্টে যাবে। তোমার চোখে ধাঁ ধাঁ লেগে যাবে। অথচ তুমি কিনা এখনই নিভুনিভু কম্পমান বাতির মতো কাঁপতে শুরু করে দিয়েছ!

এরপর তাজুদ্দীন অতর্কিতে প্রতাপ রায়ের উপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ঝলসে উঠা অগ্নিশিখার রূপ ধারণ করল। ডানে বামে নেচে নেচে লাফিয়ে লাফিয়ে স্থান বদল করে আক্রমণ চালাতে লাগল। প্রতাপ রায় খুব কষ্টে তাজুদ্দীনের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করছিল। তাজুদ্দীন প্রতিমুহূর্তে ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে প্রতাপ রায়ের উপর ক্রোধভরা শক্তিমত্তার ঝড় তুলে আক্রমণ চালাল। এবারের আক্রমণে প্রতাপ রায় রণে ভঙ্গ দিয়ে পিছনে সরে গেল।

প্রতাপ রায় কাঁপছে। সে তাজুদ্দীনের আক্রমণকে ঢাল দিয়ে ঠেকাল। বাঁধা পেয়ে তাজুদ্দীন ঝড়ের বেগে ছুটে এল। ঢাল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রতাপ রায়ের তরবারি ধরা হাত ধরে সজোরে টান মারল। তার পেটে জোরে হাঁটু দিয়ে আঘাত করল। প্রতাপ রায় ব্যাথায় কুকড়ে উঠল। তাজুদ্দীন তার কাছ থেকে তরবারি-ঢাল কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলল। এরপর দুহাত দিয়ে তাকে শূন্যে তুলে ধরল। কিছুক্ষণ ধরে রেখে উঁচু করে ঘুরিয়ে রাজা সুলাহদির পায়ের কাছে তাকে ফেলে দিল।

প্রতাপ রায় রাজা সুলাহদির পায়ের কাছে পড়ার পর নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসল। লজ্জা আর অপমানে মাথা নিচু করে থাকল। রাজা সুলাহদির ভাই ও রাণীর ভাবভঙ্গি ছিল ভিন্ন। তারা তাজুদ্দীনের এভাবে জয়ী হওয়া এবং প্রতাপ রায়কে রাজা সুলাহদির পায়ের উপর ছুঁড়ে দেওয়াকে পছন্দ করলেন না। এ কারণে তাদের চেহারায় গাম্ভীর্যতা ও অসন্তুষ্টির চিহ্ন ফুটে উঠল।

এতদসত্ত্বেও রাজা সুলাহদি বেশ কিছুক্ষণ মুচকি হেসে তাজুদ্দীনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এরপর বললেন-

আজনবি, এ লড়াইয়ে জিতে তুমি প্রমাণ করে দিলে যে, তুমি একজন ভাল তরবারি চালনাকারী ও বাহাদুর ব্যক্তি। তোমার মতো বীর ও শক্তিধর মানুষ প্রতিদিন জন্ম নেয় না। এমন তুলনাহীন শক্তিশালী হওয়ার কারণে তোমার কোন লশকরে থাকা উচিত ছিল। এ সময় তোমার জন্য একটা দায়িত্বের কথা আমার মাথায় আসছে। তবে শর্ত হলো, আমার মেয়ে যদি তাতে রাজী থাকে।

রাজা সুলাহদি থামলেন। এরপর কাছে বসে থাকা রাজকুমারি আন্নাবতীর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন-

আজনবি, এ আমার রাজকুমারী। আন্নাবতী তার নাম। তুমি দেখতে পাচ্ছ, সে খুব সুন্দরী, রূপবতী ও সুদর্শনা। একারণে তাকে আমি আদর করে 'রাজসুন্দরী' বলে ডাকি। সুন্দরী হওয়ার পাশাপাশি মেয়ে আমার গুণবতী, সুশিক্ষিতা ও ভদ্রও। বেশ ভালো তরবারি চালাতে পারে। ঘোড়সওয়ার হিসেবেও সে বেশ দক্ষ। শিকারের শখও আছে তার। তোমার তরবারি চালানোতে অভিজ্ঞতা, শক্তি ও তাকত দেখে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি তোমার কাঁধে দুটি কাজের দায়িত্ব দেব। একটা হচ্ছে তুমি আমার রাজকুমারী আন্নাবতীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে। আর অপরটি হচ্ছে, তুমি

তাকে তরবারি চালানোতে আরও ভালো প্রশিক্ষণ দেবে। তবে শর্ত হচ্ছে, আমার মেয়ে যদি এ দুটি সিদ্ধান্ত মেনে নেয়, তাহলেই তা মঞ্জুর হবে।
রাজা সুলাহদি আরও কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু মাঝখানে রাজকুমারী আন্নাবতী কথা বলে উঠল। তাজুদ্দীনের দিকে তাকিয়ে রাজকুমারী বলল-
আমি আমার নিরাপত্তার রক্ষক বা তরবারি চালনার গুরু হিসেবে তাকে মেনে নিতে কোনোভাবেই প্রস্তুত নই। সে অচ্ছুৎ ও ম্লেচ্ছ। এরা এমন ধরনের লোক- যে রাস্তা দিয়ে এরা চলাফেরা করে আমি সে পথে চলতেও পছন্দ করি না।
রাজকুমারী আন্নাবতীর এ সিদ্ধান্তে সবাই সন্তুষ্ট হলো। রাজা সুলাহদিও মুচকি হাসলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে তিনি পুত্রদের সাথে সলাপরামর্শ করলেন। এরপর তার পুত্র লছমন দাস তাজুদ্দীনকে লক্ষ্য করে বলল-
আজনবি, তুমি যেহেতু তরবারি চালনার লড়াইয়ে জয় লাভ করেছ, তাই এ শহরের বাইরে তুমি যে অন্যায় করেছ, তা ক্ষমা করে দেওয়া হলো। এর পাশাপাশি তুমি যেহেতু এখানে কাজের সন্ধানে এসেছ, তাই তুমি অচ্ছুৎ ও ম্লেচ্ছ হওয়াসত্ত্বেও তোমাকে নিরাশ করা হবে না।
দেখো, উজাইন শহরের বাইরে আমাদের বিশেষ ধরনের একটা আস্তাবল রয়েছে। যেসব ঘোড়া শিকারের কাজে ব্যবহার করা হয়, সেসব ঘোড়াকে ওখানে রাখা হয়েছে। এ ঘোড়াগুলো বেশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তোমাকে ওই আস্তাবলে কাজ দেওয়া হলো। সেখানে তুমি ঘোড়ার দেখাশুনা, তাদের যত্ন ও দানাপানির ব্যবস্থা করবে। ওখানে আরও অনেক কর্মচারি আছে। তারা সবাই অচ্ছুৎ ও ম্লেচ্ছ। তুমি যেহেতু অচ্ছুৎ, তাই তুমি তাদের সাথেই থাকবে। তারা আস্তাবলে যে কাজ করে, তুমিও তাই করবে। আমার মতে, একজন অচ্ছুৎ ও ম্লেচ্ছর জন্য আমাদের এখানে এর চেয়ে ভালো কোন কাজ নেই। এখন বলো, তুমি কি এ কাজে রাজী?
তাজুদ্দীন যেহেতু উদ্দেশ্যকে সফল করতে চায় এবং যে উদ্দেশ্যের জন্য সে এ অজুহাত দাঁড় করিয়েছে যে, সে রাজা সুলাহদির কাছে কাজের জন্য এসেছে- তাতে সে অর্ধেকটা সফল হয়েছে। অচ্ছুৎ মেয়েটিকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ সে করে দিয়েছে। এ অপরাধের শাস্তি থেকে সে বেঁচে গেছে। কাজও মিলে গেল। তার চেহারায় হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল। লছমন দাসের দিকে তাকিয়ে বলল-
রাজকুমার, আমি এ কাজ করতে রাজী। আমি মনে করি, আমার প্রতি এটা আপনাদের বড় অনুগ্রহ যে, আমাকে আপনারা কাজ দিয়েছেন।
শুধু রাজা সুলাহদি নয়, বরং তার পুত্র, রাণী দুর্গাবতী ছাড়াও রাজকুমারী আন্নাবতীও বেশ খুশী হলো। রাজকুমারী আন্নাবতী তাজুদ্দীনের দিকে তাকিয়ে বলল-
তুমি মুসলমান অঞ্চল থেকে এসেছ। আমরা কিন্তু মুসলমানদের ম্লেচ্ছ ও অচ্ছুৎ মনে করি। ম্লেচ্ছ ও অচ্ছুতদের সাথে আমরা যে আচার মেনে চলি, তা তুমি জান না। আমি কিছুটা ধারণা দিচ্ছি। বাকী আরও কিছু আস্তাবলের অচ্ছুৎ ও ম্লেচ্ছ কর্মচারীরা তোমাকে বুঝিয়ে দেবে।
দেখো, আমরা ব্রাহ্মণ। কোন শূদ্র যদি কোন ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তোলে, তাহলে তার হাত কেটে দেয়া হয়। যদি সে কোন ব্রাহ্মণকে লাথি মারে তাহলে তার পা কেটে দেয়া হয়। যদি সে কোন ব্রাহ্মণের পাশাপাশি বসে, তাহলে রাজার দায়িত্ব হচ্ছে, তার পিঠে গরম ছ্যাঁকা দিয়ে দাগ দিয়ে দেবে। আর যদি কোন শূদ্র কোন ব্রাহ্মণকে থু থু দেয়, তাহলে তার ঠোঁট কেটে দেওয়া হবে। যদি কোন শূদ্র বা অচ্ছুৎ কোন ব্রাহ্মণের নাম অশ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করে অথবা সে কোন ব্রাহ্মণকে গালি দেয়, তাহলে রাজার দায়িত্ব হচ্ছে, নয় আঙ্গুল পরিমাণ একটা লোহার পেরেক গরম করে তার গলায় সেঁধিয়ে দেবে।
ম্লেচ্ছকে যদি মুক্তও করে দেয়া হয়, তবুও তাকে মুক্ত মনে করা হবে না। কেননা প্রকৃতি তাদের দাস করেই সৃষ্টি করেছে। তারা জন্মগত দাস। অচ্ছুৎ ও ম্লেচ্ছর ধনদৌলত জমা করার কোন অধিকার নেই। যদি তাদের ধনদৌলত জমা করার সুযোগ মিলেও, তাহলেও তা করতে পারবে না। এ কথাও মনে গেঁথে রেখো যে, অচ্ছুতের ধনদৌলত ব্রাহ্মণ জোরজবরদস্তি নিয়ে নিতে পারবে। যদি কোন ব্রাহ্মণ এমনটি করে, তাহলে সে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না।
এতটুকু বলার পর রাজকুমারী আন্নাবতী থামল। এরপর আবার বলা শুরু করল-
এ কয়েকটি ছোট ছোট কথা আমি তোমাকে আগেই জানিয়ে দিলাম। তোমার দ্বারা কী কাজ নেওয়া হবে, তাতো তোমাকে বলেই দেওয়া হয়েছে।
রাজকুমারী আন্নাবতী যখন চুপ করল, তখন রাজা সুলাহদি লছমন দাসের দিকে তাকিয়ে বললেন-
লছমন বেটা আমার, কাউকে তার সাথে পাঠাও, যে তাকে শহরের বাইরে আস্তাবল পর্যন্ত নিয়ে যাবে। ওখানে তার থাকার ব্যবস্থা করবে। আর ওখানে যারা কাজ করছে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। এতটুকু বলার পর রাজা সুলাহদি আরও কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু এ সময় রাজকুমারী আন্নাবতী বলে উঠল, আমাদের বলা হয়েছে যে, তুমি একটি উন্নতমানের ঘোড়ায় চড়ে এসেছ। সে ঘোড়া সাথে করে নিয়ে যাও। তবে ঘোড়ায় চড়ে যাবে না। যে তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, ঘোড়ার বাগ ধরে তার সাথে সাথে যাবে। সে ঘোড়ায় চড়ে যাবে, আর তুমি পায়ে হেঁটে যাবে। কেননা, তুমি অচ্ছুৎ ও ম্লেচ্ছ। এ ঘোড়াকেও ওই আস্তাবলে বেঁধে রাখবে। এখন থেকে এ ঘোড়া তোমার নয়। এখন থেকে তা আস্তাবলের মালিকানাধীন। কেননা আমাদের সমাজে কোন অচ্ছুৎ ও ম্লেচ্ছর ঘোড়া রাখার অনুমতি নেই। ম্লেচ্ছ ও অচ্ছুৎ শুধু কুকুর পালন করতে পারবে।
এসব কথা তাজুদ্দীন বেশ ধৈর্যের সাথে হজম করল। অন্য কোথাও কেউ এ নিয়ে কথা বললে, নিশ্চিত সে তার হলকুম কেটে দিত। কিন্তু এখানে বিষয়টা ভিন্ন ছিল। তাকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে সফল হতে হবে। উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য প্রতিটি রূঢ় কথা শুনেও মুখে হাসিভাব ধরে রেখেছে। বারবার মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন জুগিয়েছে। তার আচরণে রাজার রাজকুমার, রাণী ও রাজকুমারী অত্যন্ত সন্তোষজনক দৃষ্টিতে অবলোকন করেছে।
লছমন দাস তার আসন থেকে উঠে দাঁড়াল। তাজুদ্দীনকে লক্ষ্য করে বলল, আমার সাথে এসো।
তাজুদ্দীন বাইরে বেরিয়ে এল। লছমন দাস একটা লোক ঠিক করল। সে লছমন দাসের কথামতো তাজুদ্দীনকে উজাইন শহরের বাইরে আস্তাবলের দিকে রওনা দিল। সে তার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চলল। আর তাজুদ্দীন তার ঘোড়ার লাগাম ধরে পায়ে হেঁটে চলতে লাগল।
তারা শহরের বাইরে বেরিয়ে এল। এ মুহূর্তে লছমন দাসের পাঠানো লোকটি ঘোড়ায় চেপে আগে আগে চলছে। আর তাজুদ্দীন তার বেশ পিছে স্বীয় ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে অনুসরণ করে চলছে। এ সময় তাজুদ্দীন তার পিছে কারও পায়ের মৃদু আওয়াজ শুনতে পেল। ফিরে তাকাতে দেখতে পেল তার পিছে পিছে অত্যন্ত ধীরে ধীরে হালকা পদক্ষেপে ভাঞ্জী এগিয়ে আসছে। তাজুদ্দীন ভাঞ্জীর দিকে তাকাতেই সে ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে চুপ থাকতে ইশারা করল। তাজুদ্দীন মুখে হাসি ফুটিয়ে হাতে ইশারা করে হাঁ-বোধক জবাব দিল। তাকে ইশারায় কাছে আসতে বলল। ভাঞ্জী কাছে আসতেই

তাজুদ্দীন তাকে কানে কানে বলল-
ভাঞ্জী, দেখো সূর্য ডুবে যাচ্ছে। রাজা সুলাহদি আমাকে তার আস্তাবলে কাজ দিয়েছে। এই যে লোকটা আমার আগে আগে যাচ্ছে, সে ওখানকার কর্মচারীদের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য যাচ্ছে। তুমি এক কাজ করো, খুব দ্রুত ফিরে যাও। মার্থাকে নিয়ে এসে মহাসড়কের সেই ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থেকো, যেখানে আমি লছমন দাসের হাত থেকে ঐ অচ্ছুৎ মেয়েটির প্রাণ বাঁচিয়েছি আমি অচিরেই সেখানে পৌছে যাব দেখো, দেরী করো না। মার্থাকে নিয়ে অতি দ্রুত সেখানে পৌছে যাও এখন তুমি যাও, সূর্য ডুবে গেছে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার ছেয়ে যাবে। আমার আগে আগে যাওয়া এ লোকটির একটি বিহিত করে খুব দ্রুত পৌছে যাব। অতিরিক্ত একটি ঘোড়াও সাথে করে নিয়ে যাব। যাতে চেপে মার্থা আমার সাথে রওনা দেবে। এখন তুমি যাও। লোকটি পিছন ফিরে আবার না দেখে ফেলে। ভাঞ্জী আনন্দে নিশ্চিন্তে সেখান থেকে ফিরে গেল।

***

সূর্য ডুবে গেছে। দিগন্তে ধীরে ধীরে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ তাজুদ্দীন পেছন থেকে ঐ ঘোড়সওয়ারকে লক্ষ্য করে বলল-
মহারাজ, রাজার আস্তাবল এখান থেকে কত দূরে? আমাদেরকে আর কত দূর যেতে হবে?
মহারাজ শব্দ শুনে লোকটি চমকে উঠল। সে ঘোড়া থামিয়ে দিল। সহাস্যমুখে সে তাজুদ্দীনের দিকে তাকাল।
- তোমাকে আমার একজন ভাল ও ভদ্র মানুষ মনে হচ্ছে। মানুষকে সম্বোধন করার আদবও তোমার বেশ ভালো। আস্তাবল এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়।
তার থেমে যাওয়াতে তাজুদ্দীন নিশ্চিন্ত হলো। সম্ভবত সে এমনটাই চাচ্ছিল। সে তাকে কিছুক্ষণ থামিয়ে রাখতে চাচ্ছে, যাতে অন্ধকার গাঢ় হয়। সুতরাং তাকে থামানোর জন্য সে কথা বাড়াতে লাগল-
আপনাকে যেহেতু আমাকে আস্তাবল নিয়ে গিয়ে ওখানকার লোকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে, সেহেতু এ মুহূর্তে আপনিই আমার রাজা-মহারাজ। কিছুক্ষণ থেমে আমার কথা শুনুন। তারপর আস্তাবলের দিকে রওনা দেওয়া যাবে।
লোকটি তাজুদ্দীনের কথায় ফুলল না, বরং বুঝতে চেষ্টা করল। তৎক্ষণাৎ ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। বলল, যতক্ষণ তুমি চাও, আমি এখানে থেমে থাকব। বলো, কী বলতে চাও তুমি?
তাজুদ্দীন তার কাছে এগিয়ে গেল এবং তাকে লক্ষ্য করে বলল-
আসলে আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে, রাজা যেহেতু আমাকে এখানে তার আস্তাবলে কাজ দিলেন, তাই এখানে কর্মকালীন সময়ে রাজা সুলাহদির পুত্ররা ও রাজকুমারীর আচরণ আমার সাথে কেমন হবে?
লোকটি কিছুক্ষণ ভাবনায় ডুবে গেল। তারপর হালকা হাসিতে ফেটে পড়ে বলল-
তুমিও দেখছি নাদান। আসলে তোমারও এতে কোন দোষ নাই। তুমি তো এ অঞ্চলে নতুন এসেছ। ব্রাহ্মণরা অচ্ছুতের সাথে যে আচরণ করেন, তোমার সাথে ঠিক সেই আচরণটিই করা হবে। যেমন কোন মালিক তার কর্মচারীর সাথে, কোন মনিব তার গোলামের সাথে, কোন প্রভু তার দাসের সাথে যেমন আচরণ করেন, তোমার সাথেও

ঠিক সেই আচরণ করা হবে। তুমি আমাকে উত্তম শব্দ দিয়ে সম্বোধন করেছ, তোমাকে আমার ভালো ও ধার্মিক মানুষ মনে হচ্ছে। তুমি যেহেতু জানতে চাচ্ছ, তাই বলছি। আমার ধারণা ও অনুমান অনুযায়ী এ কাজটা তোমার জন্য মানায় না। আমি তোমার ও প্রতাপ রায়ের মাঝে তরবারির লড়াই তো দেখিনি, তবে আমাকে জানানো হয়েছে যে, তুমি খুব সহজেই প্রতাপ রায়কে তরবারির লড়াইয়ে কুপোকাত করে দিয়েছ। প্রতাপ রায়কে এ রাজ্যে সবচেয়ে ভালো তরবারি চালনাকারী মনে করা হয়। তোমার এ কৃতিত্বের কারণে তো তোমাকে লশকরে ভালো একটা পদ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণরা মুসলমানদেরকে অচ্ছুৎ ও ম্লেচ্ছ মনে করে। সেকারণেই তোমাকে লশকরে পদ দেওয়া হয়নি। আমি তোমাকে সুপরামর্শ দেব যে এ কাজ তোমার জন্য বেমানান। কেননা এখানে কর্মকালীন সময়ে রাজকুমারী আন্নাবতী ও তার ভাই তোমার মান-মর্যাদাকে অবজ্ঞা করবেন, বীরত্বকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবেন, তোমার আবেগ-তোমার অনুভূতিকে কঠোরতার সাথে পিষে মারবেন। এ ব্রাহ্মণরা বড় আশ্চর্য প্রকৃতির। এরা অপরের সুস্থ মস্তিষ্ককে অতিশয় যন্ত্রণায় ফেলে দিতে গর্ববোধ করেন। অন্যদের সাথে তুচ্ছার্থ শব্দ ব্যবহার করেন। অব্রাহ্মণদের মানসিকভাবে পিষতে ও তাদের বুদ্ধিকে ভোঁতা করে দেওয়ার মতো আচরণ করতেও এরা গর্ব অনুভব করেন। তবু আমি তোমার সাথে এমন কথা এ জন্য বলছি যে, আমি সনাতন ধর্মের অনুসারী। আমি এ সব ব্রাহ্মণের রীতিনীতির পক্ষের লোক নই।
তাজুদ্দীন বেশ আনন্দিত। কেননা সে লোকটিকে কথার মাঝে ডুবিয়ে দিয়েছে। দিগন্তে অন্ধকার বেশ গভীর হয়ে গেছে। তাজুদ্দীন তাকে বলল-
মেহেরবান আমার, তাদের ফাঁদে পড়ার লোক নই আমি। আমি নিজে একজন কর্মকার। যখন আমি ওই ব্রাহ্মণদের রাজকুমারকে রক্তেরঞ্জিত করব, তাদের সতর্কতার বাতি নিভিয়ে দেব এবং তাদের গভীর আশাকে ধুলায় মিশিয়ে দেব, তখন সব দেখতে পাবে।
লোকটি হাসিতে ফেটে পড়ল।
এ কী ধরনের কথা বলছ তুমি? এমন অনর্থক বাহাদুরি কথা কেন বলছ, যার বাস্তবায়ন করতে পারবে না।
প্রত্যুত্তরে তাজুদ্দীন মৃদু হেসে বলল, আমি অন্ধ নই। আপনি দেখবেন, আমি তাদের আকৃতি ও তাদের সংস্কৃতির ঘেরাওয়ের মাঝে রক্তাক্ত বিপ্লব ঘটিয়ে দেব। জনাব আমি বালুতে অঙ্কিত কোন লেখা নই যে, তাদের কালো সংস্কৃতির আগ্রাসন ও ধর্মের অন্ধরীতির শিকার হব। আমি তো নিজেই তাদের জন্য প্রাকৃতিক শক্তিরূপে আবির্ভূত হব।
লোকটি আবার হাসল।
এ সব কথা অনর্থক। হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণদের যেভাবে বিবেচনা করে, তা আর কোনো সমাজে করা হয় না। আমাদের ধর্মীয় পুস্তকাদি ও আমাদের শাস্ত্র ব্রাহ্মণদের এতো উঁচুতে নিয়ে গেছে যে, ব্রাহ্মণদের মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে গেছে। এতোটাই নষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে মানুষই মনে করেন না। আমাদের শাস্ত্র বলে, ব্রাহ্মণরা যখন জন্ম নেন, তখন তারা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিজীব হিসেবে জন্ম নেন। তারা সৃষ্টিজীবের রাজা। তাদের কাজ শুধু বেদশাস্ত্রের প্রচার করা। জগতে যা কিছু আছে তা সবই ব্রাহ্মণদের। কেননা সৃষ্টির মধ্যে তারাই সেরা, তারাই সর্বোত্তম। জগতের সবকিছুই তাদের।

(চলবে)

মেয়েদের পবিত্র কুরআন হিফ্য করা

প্রশ্ন : মেয়েদের কুরআন হিফ্য করার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি?

উত্তর : শরীয়তে কুরআন শরীফ হিফয করার ফযিলত উল্লেখিত হয়েছে। এ ব্যাপারে ছেলে-মেয়ের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি। বরং ছেলে-মেয়ে সকলের জন্য কুরআন শরীফ হিফয করে তার ফযিলত লাভের সুযোগ রয়েছে। অতএব উপযোগী পরিবেশ পরিস্থিতিতে মেধাবী, সুস্থ, সবল মেয়েদেরকে কুরআন শরীফ হিফয করাতে শরীয়তে কোন বাধা নেই। বরং উৎসাহিত করা হয়েছে।

প্রমাণ

وحفظ جميع القرآن فرض كفاية (الدر المختار على ردالمحتار جـ ٢ صـ ٢٥٨)

* والحاصل انه إذا كان خير الكلام كلام الله فذلك خير الناس بعد النبيين من يتعلم القرآن و يعلمه. (مرقاة شرح مشكوة جـ ٢ صـ ٥٧٣)

* عن أبي سعيد الخدريّ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن أى حفظه وعلم مبانيه و تدبر معانيه والعمل بما فيه عن ذكرى ومسئلتى أعطيته أى بسبب ذلك أفضل ما أعطى السائلين (مرقاة شرح مشكوة جـ ٢ صـ ٥٩٠)

* عن على ابن طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه فى عشرة أهل بيته كلهم قد وجبت له النار - (ترمذى شريف جـ ٢ صـ ١١٤)

* وكذا فى فتاوى محموديه جـ ٧ صـ ١٨٢ و ١٨٤

পড়ার অনুপযোগী কুরআনের কপির বিষয়ে করণীয়

প্রশ্ন : আমি একবার এক জামে মসজিদের কিছু সংখ্যক পুরাতন ছেঁড়া-ফাড়া পড়ার অনুপযোগী কুরআন শরীফের কপি পুড়িয়ে ছাইগুলো এক মাদরাসার ফুল বাগানে দাফন করেছিলাম। আর একবার কিছু কপি গ্রামের কবরস্তানে দাফন করেছিলাম। এখন মুফতী সাহেবের নিকট আমার জানার বিষয় হলো, উল্লেখিত পদ্ধতিতে আমি যে পুরাতন কুরআন শরীফের হেফাজত করেছি তা শরীয়ত সম্মত হয়েছে কি? প্রমাণসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : শরীয়তে ছেঁড়া-ফাড়া বা বেশি পুরাতন- পড়ার অনুপযোগী কুরআন শরীফ হেফাজতের সঠিক নিয়ম হচ্ছে, সেগুলোকে কোন পাক-সাফ কাপড়ে জড়িয়ে গোরস্তানে বা এমন কোন স্থানে মাইয়েত দাফন করার ন্যায় সম্মানের সাথে দাফন করবে, যেখানে সাধারণতঃ লোকজন চলাফেরা করে না। হেফাজতের নিয়তে ছেঁড়া-ফাড়া কুরআন শরীফ আগুনে পোড়ানো যায় এমন একটি অভিমতও কিতাবে পাওয়া যায়, তবে ফিকাহবিদগণ প্রথম অভিমতটিকেই উপযুক্ত মনে করেন।

প্রমাণ :

* المصحف اذا صار خلقا لايقرأ منه ويخاف أن يضيع يجعل فى خرقة طاهرة ويدفن ويلحد له لانه لو شق ودفن يحتاج إلى اهالة التراب عليه وفى ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه بحيث لا يصل التراب إليه فهو حسن. المصحف إذا صار خلقا وتعذرت القرأة منه لا يحرق بالنار أشار الشيبانى إلى هذا فى السير الكبير وبه نأخذ كذا فى الذخيرة. (الفتاوى العالمكيرية جـ ٥ صـ ٣٢٣)

* وكذا فى خير الفتاوى جـ ١ صـ ٢١٤ وامداد الاحكام جـ ١ صـ ٢٢٩

সিজারে সন্তান হওয়ার পর হায়েয-নেফাসের সময় সীমা

প্রশ্ন ১. কোন নারীর অপারেশনের মাধ্যমে (সিজারে) সন্তান ভূমিষ্ট হলে তার নেফাস কত দিন ধর্তব্য হবে?

উত্তর : কোন নারীর অপারেশনের মাধ্যমে (সিযারে) সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর যদি তার জরায়ু থেকে রক্ত নির্গত হয়, তাহলে অন্যান্য নারীর ন্যায় তারও নেফাসের সর্বোচ্চ সময় সীমা চল্লিশ দিন, সর্বনিম্ন কোন সীমা নির্ধারিত নেই।

প্রমাণ :

* فلو ولدته من سرتها ان سال الدم من الرحم فنفساء وإلا فذات جرح وان ثبت له احكام الولد -. رد المحتار جـ ١ صـ ٤٩٦

* لاحد لأقله وأكثره اربعون يوما الدر المختار مع رد المحتار جـ ١ صـ ٤٩٦-٤٩٧

প্রশ্ন : ২. জনৈক মহিলার প্রতিমাসে সাতদিন হায়েয আসে। কিন্তু কোন এক মাসে যদি তার তিনদিন রক্ত আসার পর হায়েয বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কি সে তার পূর্বের নিয়ম মোতাবেক নামায রোযা হতে বিরত থাকবে না রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসল করে নামায রোযা আরম্ভ করবে?

উত্তর : যদি কোন মহিলার প্রতি মাসের নিয়মের পূর্বে হায়েয বা নেফাস বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সতর্কতাবশত স্বামীর জন্য তো নিয়মিত সময় সীমা শেষ হওয়ার পূর্বে তার সঙ্গে সহবাস করা মাকরূহ হবে। তবে যেদিন থেকে তার রক্ত বন্ধ হয়েছে সেদিন থেকে সে গোসল করে অবশ্যই নামায পড়বে ও রোযা রাখবে। কিন্তু স্বামী সহবাস থেকে বিরত থাকবে।

প্রমাণ :

* إذا انقطع دمها دون عادتها يكره قربانها وإن اغتسلتْ حتى تمضىَ عادتها وعليها أن تصلى وتصوم للاحتياطِ (الفتاوى الهندية جـ ١ صـ ٣٩)

* وكذا فى تبيين الحقائق جـ ١ صـ ٦٠ وفى خلاصة الفتاوى جـ ١ صـ ٢٣١ وفتح القدير جـ ١ صـ ١٥٢ ومراقى الفلاح صـ ٨٦

প্রশ্ন : ৩. হায়েয-নেফাস ও অপবিত্রতাবস্থায় কুরআন শরীফের আয়াত দোয়া হিসেবে পাঠ করা জায়েয হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, হায়েয-নেফাস ও অপবিত্রাবস্থায় কুরআন শরীফের দোয়ামূলক আয়াত বা সূরা দোয়া হিসেবে পাঠ করা জায়েয আছে?

প্রমাণ :

* فلو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء أو شيأ من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة لا بأس به شامية ج ١ ص ٤٥٥

* (ومنها) حرمة قراءة القرآن لا تقرأ الحائض والنفساء والجنب شيأ القرآن والآية وما دونها سواء في التحريم على الأصح إلا ان لا يقصد بما دون الآية القراءة مثل ان يقول الحمد لله يريد الشكر أو بسم الله عند الأكل غيره فانه لا بأس به هكذا في الجوهرة النيرة — ولا تحرم قراءة آية قصيرة تجرى على اللسان عند الكلام كقوله تعالى ثم نظر أو لم يولد هكذا في خلاصة الفتاوى و العالمكيرية ج ١ ص ٣٨

ঔষুধ সেবনে হায়েয বন্ধকরণ ও তার বিধান

প্রশ্ন : কোন মহিলার নিয়মিত হায়েয হয়। রমযান মাসে সে ঔষুধ সেবন করে হায়েয বন্ধ রাখল এবং রমযানের সবগুলো রোযা রাখল, নামাযও পড়ল। এমতাবস্থায় সম্ভাব্য হায়েযের দিনগুলোর রোযা ও নামাযের হুকুম কী হবে?

উত্তর : জরায়ু থেকে নির্গত রক্ত লজ্জাস্থান অতিক্রম করে বের না হলে তার হায়েযই সাব্যস্ত হবে না। (রক্ত বের না হওয়াটা স্বাভাবিকভাবে হোক কিংবা ঔষুধের কারণে হোক উভয় অবস্থায়ই সে পাক থাকবে।) অতএব এ অবস্থায় নামায রোযা সবই দুরস্ত হবে।

প্রমাণ :

* ومنها خروج الدم إلى الفرج الخارج ولو بسقوط الكرسف فما دام بعض الكرسف حائلا بين الدم والفرج الخارج لا يكون حيضًا هكذا في المحيط (الفصل الرابع في احكام الحيض والنفاس والاستحاضة) لا يثبت حكم كل منها إلا بخروج الدم وظهوره وهذا هوظاهر مذهب اصحابنا وعليه عامة مشايخنا وعليه الفتوى (فتاوى عالمكيرى ج ١ ص ٣٦-٣٧)

* وكذا في رد المحتار ج ١ ص ٤٧٥ وبدائع الصنائع ج ١ ص ٣٩-٤٠ وحاشية تبيين الحقائق ج ١ ص ١٥٨

রক্ত বা পেশাব ভরা শিশি নিয়ে নামায আদায় করা

প্রশ্ন : পকেটে রক্ত বা পেশাবের শিশি নিয়ে নামায পড়লে নামায শুদ্ধ হবে কি?

উত্তর : পকেটে কিংবা কাপড়ের অন্য যে কোন অংশে নাপাকী বহন করা অবস্থায় নামায আদায় করলে নামায শুদ্ধ হবে না। বরং নামায আদায় করার সময় তা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন কোন জায়গায় রাখতে হবে।

প্রমাণ :

* بخلاف ما لو حمل قارورة مضمومة فيها بول لا تجوز صلاته لأنه في غير معدنها (رد المحتار ج ٣ ص ٢٤٧ شاملة)

* رجل صلى وفي كمه قارورة فيها بول لا تجوز الصلاة سواء كانت ممتلئة لم تكن. (هندية ج ٢ ص ٤١٥)

* وكذا في البحر الرائق ج ١ ص ٣٤١ وعناية ج ١ ص ١٣ شاملة

লেপ, তোশক বা বালিশে প্রশ্রাব লাগলে তা পবিত্র করার উপায়

প্রশ্ন : ১. মোটা লেপ, তোশক বা বালিশে প্রশ্রাব লাগলে তা পবিত্র করার উপায় কি?

উত্তর : লেপ, তোশক বা বালিশ পবিত্র করার দু'টি উপায় রয়েছে। যথা ১. নদ-নদী, খাল-বিল, বড় পুকুর, বড় হাউয ইত্যাদি স্রোতধারাসম্পন্ন (ماء كثير) বা অধিক পানির জলাধার হলে তাতে এক রাত অথবা এ পরিমাণ সময় চুবিয়ে রেখে উঠাতে হবে, যাতে মনে প্রবল ধারণা জন্মে যে, হ্যাঁ নাপাকি দূর হয়ে বস্তুগুলো পাক হয়ে গেছে। এভাবে একবার করলেই যথেষ্ট হবে এবং পানি টপকানোর পূর্বেই এসব পাক সাব্যস্ত হবে। ২. প্রবহমান পানি না হলে তিনবার ধুতে হবে। প্রতিবারই নতুন পানি নিতে হবে এবং এমনভাবে পানি ঝরাতে হবে যাতে এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট না থাকে।

প্রমাণ :

البساط النجس اذا جعل في نهر وترك ليلة حتى جرى الماء عليه طهر كذا في الخلاصة ، وهو الصحيح (الفتاوى الهندية ج ١ ص ٤٣)

* وقالوا في البساط النجس اذا جعل في نهر ليلة طهر التقدير بالليلة في مسئلة البساط لقطع الوسوسة والا فالمذكور في المحيط قالوا البساط اذا تنجس فاجرى عليه الماء الى ان يتوهم زوالها طهر لأن اجراء الماء يقوم مقام العصر اهـ ولم يقيده بالليلة. (البحرالرائق ج ١ ص ٢٣٨)

اما اذا غمس الثوب في ماء جار حتى جرى عليه الماء طهر وكذا ما لا ينعصر ولا يشترط العصر فيما لا ينعصر ولا التجفيف فيما لا ينعصر ولا يشترط تكرار الغمس (البحر الرائق ج ١ ص ٢٣٧)

প্রশ্ন : ২. বীর্য বা পেশাব লেগে তোষক নাপাক হলে তা পবিত্র করার উপায় কি?

উত্তর : বীর্য বা পেশাব লেগে তোষক নাপাক হলে তা পাক করার দুটি পদ্ধতি রয়েছে

এক. যদি নদী-নালা খাল-বিল বা এ জাতীয় স্রোতধারাসম্পন্ন বা (ماء كثير) অধিক পানির জলাধার হয়, তাহলে উক্ত জলাশয়ে এক রাত বা এ পরিমান সময় চুবিয়ে রেখে তোলার পর তোষক পাক হয়ে যাবে।

দুই. যদি পানি আবদ্ধ হয়, তাহলে তিন বার ধোয়ার দ্বারা তোষক পাক হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, তিন বারের প্রত্যেক বারই পূর্ণরূপে পানি ঝড়ে নিতে হবে।

প্রকাশ থাকে যে, নাপাক তোষকে শয়ন করা বা ঘুমানো না জায়েয নয়, তাছাড়া না পাক তোষকের উপরে পাক বিছানা বা জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়াও নাজায়েয নয়। অতএব কোন বিশেষ প্রয়োজন না হলে তোষক পাক করতে গিয়ে তোষক ভিজিয়ে নষ্ট না করা উচিৎ।

প্রমাণ :

* (ولا تبذر تبذيرا) عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال التبذير انفاق المال في غير حقه (روح المعانى ج ١٥ ص ٦٣)

* قوله (بتثليث جفاف) أى جفاف كل غسلة من الغسلات الثلث قوله (اى انقطاع تقاطر)... وفي التاتارخانية حد التجفيف أن يصير بحال لا تبتل منه اليد قوله (اى غير منعصر) اى بأن تعذر عصره كالخزف أو تعسر كالبساط (رد المحتار ج ١ ص ٥٤١)

* قوله (بتثليث جفاف) أى جفاف كل غسلة من الغسلات الثلث (اى انقطاع تقاطر)... وفى التاتارخانية حد التخفيف أن يصير بحال يبتل اليد قوله (اى غير منعصر) اى بأن تعذر عصره كالخزف تعسر كالبساط (رد المحتار ج ١ ص ٥٤١)

ওযুতে হাত ধোয়ার নিয়ম

প্রশ্ন : ওযুতে কেউ হাত ধৌত করে কনুইয়ের দিক থেকে আবার কেউ ধৌত করে আঙ্গুলের দিক থেকে, এ ক্ষেত্রে শরীয়তের সঠিক বিধান কি?

উত্তর : ওযুতে আঙ্গুলের দিক থেকে হাত ধৌত করা সুন্নত। অনুরূপভাবে পাও আঙ্গুলের দিক থেকে ধৌত করাও সুন্নত।

প্রমাণ :

* ومن السنن البداءة من رؤس الاصابع فى اليدين والرجلين كذا فى فتح القدير وهكذا فى المحيط. فتاوى عالمكيرية ج ١ ص ٨

* وكذا فى فتاوى دار العلوم ديوبند مكمل ومدلل ج ص ١٢٨ وخير الفتاوى ج ٢ ص ٧٤ والفقه الاسلامى وادلته ج ١ ص ٤٠٣

কান মাছাহ করার নিয়ম

প্রশ্ন : ওযুতে কান মাছাহ করতে গিয়ে কেউ দু'হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুল কানের ছিদ্রে প্রবেশ করায় আবার কেউ শাহাদাত আঙ্গুল বা অনামিকা প্রবেশ করায়। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি?

উত্তর : এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো, কান মাছাহ করার জন্য দু'হাতের দু'কনিষ্ঠাঙ্গুল কানের ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে একটু নাড়া-চাড়া করবে। দু'শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কানের ছিদ্র ছাড়া কানের ভিতরের অবশিষ্টাংশ মাছাহ করবে এবং দু' বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা কানের বহিরাংশ মাছাহ করবে।

প্রমাণ :

* عن الحلوانى وشيخ الاسلام يدخل الخنصر فى اذنيه ويحركهما كذا فعل صلى الله عليه وسلم والذى فى ابن ماجه باسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم مسح اذنيه فادخلهما السبابتين وخالف ابهاميه إلى ظاهر اذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما . - فتح القدير ج ١ ص ٢٧

* فى المجتبى يمسحهما بالسبابتين داخلهما وبالابهامين خارجهما وهو محت كذا فى المعراج وعن الحلوانى وشيخ الاسلام يدخل الخنصر اذنيه ويحركهما البحر الرائق ج ١ ص ٢٦

গোসল

প্রশ্ন ১. ফরয গোসলে কানের ভিতরের দিকের যাহেরী (বাহ্য) অংশে পানি গড়িয়ে দিতে গেলে কানের ভিতরে পানি চলে যাওয়ার প্রবল আশংকা আছে। এমতাবস্থায় পানি টপকানো ছাড়া কানের ঐ অংশে পানি পৌছালে গোসল দুরস্ত হবে কি?

উত্তর : উল্লিখিত অবস্থায় যদি কানের ভিতরের জাহেরী অংশে পানি গড়িয়ে না দিয়েও ঐ অংশে পানি পৌছানো যায়, তাহলে গোসল দুরস্ত হয়ে যাবে। কেননা সে কানের ভিতরের জাহেরী অংশে পানি টপকানোর ক্ষেত্রে অপারগ।

প্রমাণ :

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية

* وهو تطهير جميع البدن واسم البدن يقع على الظاهر والباطن الا ما يتعذر ايصال الماء اليه خارج عن قضية النص وكذا ما يتعسر لأن المتعسر منفى كالمتعذر كداخل العينين الخ البحر الرائق ج ١ ص ٤٦

* ولنا قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا أى فطهروا أبدانكم فكل ما أمكن تطهيره يجب غسله الخ تبيين الحقائق ج ١ ص

প্রশ্ন : ২. ফরজ গোসল করার সময় যদি কেউ কুলি বা নাকে পানি দিতে ভুলে যায়, তাহলে জামা-কাপড় পরিধানের সময় স্মরণ হলেও কি কুলি বা নাকে পানি দেওয়ার দ্বারা গোসল হয়ে যাবে?

উত্তর : হ্যাঁ, এমতাবস্থায় স্মরণ হওয়ার পর কুলি বা নাকে পানি দেওয়ার দ্বারা গোসল হয়ে যাবে।

প্রমাণ :

ولو تركهما (اى المضمضة وكذا الاستنشاق) ناسيا فصلى ثم تذكر فعليه أن يتمضمض ويعيد ما صلى — منية المصلى ص ١٨

احسن الفتاوى ج ٢ ص ٣٣ وفى فتاوى محمودية ج ٨ ص ١٦٠

ঠাণ্ডা পানি ক্ষতিকর হলে তায়াম্মুমের বিধান

প্রশ্ন : ১. কোন ব্যক্তি ঠান্ডা পানি ব্যবহার করলে ক্ষতি হয়। এমতাবস্থায় কি তার জন্য উযু-গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম দুরস্ত হবে?

উত্তর : উল্লিখিত অবস্থায় লোকটির যদি স্বাভাবিকভাবে গরম পানির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় এবং সে উক্ত পানি ব্যবহারে সক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য তায়াম্মুম যথেষ্ট হবে না। বরং তাকে গরম পানি দিয়ে হলেও উযু-গোসল করতে হবে। পক্ষান্তরে যদি গরম পানির কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয় তবে তার জন্য তায়াম্মুম করা দুরস্ত হবে।

প্রমাণ :

* أو لمرض يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم أو برد يهلك الجنب أو يمرضه ولو فى المصر اذا لم تكن له اجرة حمام ولا ما يدفئه (الدر المختار ج ١ ص ٤١)

ان خاف الجنب أو المحدث ان اغتسل أو توضأ أن يقتله البرد او يمرضه تيمم سواء كان خارج المصر او فيه ثم اعلم ان جوازه للجنب عند ابى حنيفة مشروط بان لا يقدر على تسخين الماء ولا على اجرة الحمام فى المصر ولا يجد ثوبا يتدفأ فيه ولا مكانا يأويه فصار الاصل انه متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لا يباح له التيمم اجماعا (البحر الرائق ج ١ ص ١٤١)

* لان المحدث لا يجوز له التيمم للبرد فى الصحيح (الهندية ج ١ ص ٢٨

* وكذا فى رد المحتار ج ١ ص ٣٩٨

উত্তর প্রদান

মুফতী মুজিবুররহমান

প্রধান মুফতী, জামেয়া নূরীয়া ইসলামিয়া, ঢাকা।

নবীজী সা. এর ব্যাপারে খাদিজা রাজি. এর উপলব্ধি

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যখন চল্লিশের কাছাকাছি হল, ছয় মাস এমনভাবে কাটে যে, তিনি প্রতিদিন যা স্বপ্ন দেখেন, দিনের বেলায় তা সত্য হয়ে যায়। এগুলোকে 'রুয়ায়ে সাদেকা' বা সত্য-স্বপ্ন বলা হয়। হজরত খাদিজাতুল কুবরা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা এ বিষয়গুলো জেনে বুঝতে পারেন, তিনি এক মহান একজন ব্যক্তি। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বারা অনেক বড় বড় কাজ সম্পাদন করাবেন। দেখুন, স্বামীর অপ্রকাশিত যোগ্যতা সম্পর্কে অবগত হয়ে তার সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষন করছেন আর আজকাল স্ত্রীরা স্বামীদের ভালো ভালো গুণ স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও উপেক্ষা করে চলে।

হেরা গুহার ইবাদত

নবীজী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম ইবাদত করতে যখন হেরাগুহায় যেতেন, সাধারণত তিনি নিজেই এক সপ্তাহের রুটি-পানি নিয়ে যেতেন অনেক সময় হজরত খাদিজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা নিজেও রুটি-পানি ও খাবার নিয়ে যেতেন, খোঁজখবর নিয়ে আসতেন। ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে নবীজী- সাল-লাহু আলাইহি ওয়া সালামের আগ্রহ ছিল অত্যন্ত প্রবল। নবীজী অনেক সময়ই এক সপ্তাহ-দশদিন হেরাগুহায় ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু খাদিজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা কখনোই আপত্তি করতেন না বারণ করতেন না। খাদিজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বুঝতেন, ইবাদত করছেন, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ছেন। এজন্য প্রতিটি স্ত্রীর উচিৎ স্বামীর ভালো কাজে সহযোগী হওয়া, বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা।

প্রথম ওহী ও খাদিজা রাজি. সান্ত্বনা প্রদান

হেরাগুহায় নবীজী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম একদিন ইবাদতে নিমগ্ন। হজরত জিবরাইল আ. নবীজী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামের নিকট ওহী নিয়ে এলেন। তিনি নবীজীকে বললেন–

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

'পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।'
(সূরা আলাক : ১)

নবীজী তো লেখাপড়া জানতেন না। তাই তিনি উত্তরে বললেন– 'আমি তো পড়তে পারি না'

হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম তখন নবীজী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন এবং খুব জোরে চাপ দিলেন। হাদীসের ব্যখ্যাকারকগণ লিখেছেন, ফয়েজপ্রাপ্তির এটা একটা পদ্ধতি। এজন্য আল্লাহওয়ালাদের সাথে কেউ যখন মোআনাকা করেন, অনেক সময় আল্লাহ তায়ালা এক সিনা থেকে আরেক সিনায় ফয়েজ দেন।

হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম তিনবার এমন করার পর নবীজী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম পড়া শুরু করেন। কিন্তু নবীজী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালামকে স্ব-সুরতে দেখার কারণে এবং এমন অবস্থা প্রথমবার হওয়ার কারণে তিনি ভয় পেয়ে যান। মানুষের স্বভাব হল যে কোন অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে মানুষ ভয় পায়। যাহোক, এ অবস্থায় নবীজী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বাড়ী আসেন এবং ভীত-প্রকম্পিত অবস্থায় বলতে থাকেন– 'আমাকে কম্বল গায়ে দিয়ে দেও, আমাকে কম্বল গায়ে দিয়ে দেও।'

হজরত খাদিজাতুল কুবরা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা নবীজী সাল-লাহু আলাইহি ওয়া সালামকে চটজলদি বিছানায় শুয়ে দেন। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার এখন কেমন লাগছে। নবীজী সাল-লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বললেন–

خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي

'আমি ভয় পাচ্ছি, আমি হয়ত আর বাঁচব না।'

হজরত খাদিজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা তো নবীজীকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি এ কথা শুনে বলে উঠলেন–

فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا

'না, এমনটি কখনোই হতে পারেন না। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে কখনোই অপদস্থ করতে পারেন না।'

এরপর তিনি তাঁর কথার স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করত বললেন–

إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ 'আপনি আত্মীয়তা রক্ষা করেন।'

وَتَحْمِلُ الْكَلَّ

'অন্যের বোঝা বহন করেন, অন্যের কাজে সহযোগিতা করেন।'

وَتَقْرِي الضَّيْفَ

'অতিথিদের আপ্যায়ন করেন।'

وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ

'অসহায়-নিঃস্বদেরকে সর্বস্ব দিয়ে সাহায্য করেন।'

وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

'ভালো কাজে অন্যের পাশে দাঁড়ান। অন্যের সহযোগিতা করেন।'
প্রিয়, আপনার মধ্যে যখন এসব গুণাবলী রয়েছে, এমন গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা কখনো ধ্বংস করবেন না।

দেখুন, নেক বিবিরা কেমন গুণবতী হন। কেমন মন-মানসিকতার অধিকারী হন। প্রথমে তিনি স্বামীর চাওয়া পুরা করেছেন। বিছানায় শুয়ে দিয়ে কম্বল গায়ে দিয়ে দিয়েছেন। এরপর পাশে বসে দরদী কণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়েছেন। নবীজী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন, খাদিজার কথা শুনে আমার মনের সব ভয় দূর হয়ে যায়।

এরা হলেন নেক বিবি। এরা হলেন গুণবতী স্ত্রী। এরা সর্বাবস্থায় স্বামীর মন জয় করে নেন। মনে রাখবেন, স্বামীর অন্তর লড়াই করে কখনো জয় করা যায় না। তরবারি দিয়ে জয় করা যায় না। স্বামীর মন জয় করা যায় কেবল নিখাঁদ প্রেম ও ভালোবাসা দ্বারা। যে স্ত্রী ভালোবাসা দিয়ে স্বামীর মন জয় করতে পারে না সে তরবারি দিয়েও জয় করতে পারবে না। যাহোক, হজরত খাদিজাতুল কুবরা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার কথায় নবীজী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম অনেক সান্ত্বনা লাভ করেন।

নবীজী সা. কে নিয়ে খাদিজা রাজি. এর দৌড়-ঝাপ

হজরত খাদিজাতুল কুবরা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা এতটুকু করেই ক্ষান্ত হলেন না। পরদিন তিনি তাঁর চাচাত ভাই-যিনি তাওরাতের পন্ডিত ছিলেন, ইবাদতগুজার ছিলেন-তার নিকট নবীজী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন-

يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ

আপনার ভাতিজার থেকে শুনুন কি হয়েছে।

ওয়ারাকা বিন নওয়াফিল-যিনি খৃষ্টান ছিলেন, হিব্রু ভাষা জানতেন-তিনি সব শুনে বললেন, হজরত মুসা আলাইহিস সালামের নিকট যে ফেরেশতা এসেছিল, মুহাম্মাদের নিকটও সেই ফেরেশতা এসেছিল। এরপর সে নবীজী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামকে সম্বোধন করে বললেন, আপনি তো আল্লাহর নবী। তাওরাতে এসব নিদর্শন উল্লেখ রয়েছে। ওয়ারাকা বিন নওয়াফিল তাওরাতের উদৃতি দিয়ে সেই সব নিদর্শন বলে যেতে থাকল। আপনার কওম আপনার বিরোধিতা করবে। এক সময় তারা আপনাকে আপনার শহর থেকে বের করে দিবে। এ কথা শুনে নবীজী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বিস্ময়ভরে জিজ্ঞাসা করেন, আমাকে বের করে দিবে? সে বলল, হ্যাঁ, আপনাকে আপনার কওমের লোকেরা এ শহর থেকে বের করে দিবে। সে আরো বলল, ঐ সময় পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকলে আমি আপনার সাহায্য করব।

যাহোক, সব কথা শুনে নবীজী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামের এ বিশ্বাস হয় যে, এটা ছিল ওহী। আমি আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ পয়গাম ও বার্তা লাভ করেছি।

যিনি সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন

হজরত খাদিজাতুল কুবরা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা নবীজী সাল-লাহু আলাইহি ওয়া সালাম কে বাড়ী ফিরে এসে নবীজী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম প্রতি ঈমান আনায়ন করেন এবং বিশাল সম্মান মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হন। মনে রাখবেন, যখন ইতিহাস হতে থাকে, তখন স্বীকার করা ফজিলতের বিষয়, শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়। ইতিহাস যখন হয়ে যায় তখন শত্রুও তা বিশ্বাস করে, মেনে নেয়। হজরত খাদিজাতুল কুবরা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার বিশাল বড় গুণ যে, গোটা পৃথিবীর মানুষ যখন তাঁকে ছেড়ে গিয়েছে তখনো তিনি তাঁর পাশে ছিলেন। যখন পৃথিবীর কেউই তাঁকে স্বীকার করেনি, তখন তিনি তাঁর উপর ঈমান এনেছেন। এই নারী গোটা উম্মতের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করে আছে।

হজরত খাদিজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা নিজে শুধু ঈমান এনেছেন তাই নয় বরং ঘরের পরিবেশ এমন বানিয়েছিলেন যে এবং নিজের স্বামীকে এতটাই সম্মান দিয়েছিলেন, ঘরের ছোট ছেলে জায়েদ বিন হারেসা ঈমান গ্রহণ করেন।

এ সময় হজরত আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নবীজীর পরিবারেই মানুষ হচ্ছিলেন। তাঁর মা ফাতেমা বিনতে আসাদ হজরত নবীজী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামকে খুবই মুহব্বত করত। নবীজী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামকে তিনি মাতৃস্নেহ দিয়ে লালন পালনও করেন। তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন, মুহাম্মাদ সাধারণ আর দশটি মানুষের মত নয়। সে অবশ্যই মহান একজন ব্যক্তি। তাই তিনি তাঁর কলিজার টুকরা আলীকে নবীজী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামের তত্ত্বাবধানে দেন। হজরত আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তখন খদিজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকটই থাকতেন। তিনিও ঐ সময় নবীজী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামের প্রতি ঈমান আনেন।

দেখুন, হজরত খাদিজাতুল কুবরা শুধু নিজেই ঈমান আনেননি, বরং তিনি ঘরের পরিবেশ এমনই বানিয়ে ছিলেন যে, ঘরের ছোট বাচ্চারাও ঈমান আনে।

এরপর হজরত সিদ্দিকে আকবার হজরত আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ঈমান আনেন। স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই ঈমান গ্রহণ করেন। এরপর নবীজী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামের কন্যারাও ঈমান গ্রহণ করেন।

এর থেকে অনুমান করুন, নেককার বিবিরা, দায়িত্বশীল স্ত্রীরা সংসারে স্বামীকে কি পরিমাণ ইজ্জত দিয়ে থাকে। কি পরিমাণ মূল্যায়ন করে থাকে। যার কারণে সংসারের পরিবেশই বদলে যায়।

(চলবে)

বদলে যাওয়ার গল্প

মুহাম্মাদ আকরাম

তাবলিগের অপর নাম *তাবদিল*। মসজিদের স্বর্গীয় পরিবেশে, তাবলিগের নুরানী মেহনতে মানব জীবনে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে এক অভিনব পন্থায়। এ যেনো আলাদিনের যাদুর কাঠি, যে তার ছোঁয়া পাচ্ছে, মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে। এটা *বদলে যাও বদলে যাও*-এর মত মেকি ও শুধু মুখরোচক কোন শ্লোগান নয়। বরং তাবলিগের মেহনত প্রকৃত ও বাস্তব। দিবালোকের মতো উজ্জল ও উদ্ভাসিত। তাবলিগ বদলে দিয়েছে খ্যাত-অখ্যাত কোটি মানুষের জীবন-চিত্র। ছিল ডাকাত দলেল সর্দার, হল আল্লাহর অলি। ছিলো সিনেমার প্রযোজক, হলো দ্বীনের আহবায়ক। ছিল রোগীদের ডাক্তার, হলো দায়ীদের সর্দার। ছিল ক্রিকেটার, হল দ্বীনের রাহবার। ছিল সুরকার, হলো নেককার। এ ভাবে অনেক শিল্পপতি, রাষ্ট্রপতি, অধ্যাপক, রিক্সাচালক হল আল্লাওয়ালা। অতিতের সব পাপ-পঙ্কিলতা ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে নিজেদেরকে রাঙ্গিয়ে নিয়েছেন আল্লাহর রংয়ে, রাসূলের সা. আদর্শে।

বদলে যাওয়া বিখ্যাতদের দীর্ঘ সারির ভাগ্যবানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারকার নাম হলো পাকিস্তানের জনপ্রিয় পপস্টার জুনায়েদ জামশেদ। তার জন্ম ১৯৬৪-এর তেসরা সেপ্টেম্বর। জন্মস্থান, পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের কারাচি। পিতা জামশেদ আকবর ছিলেন পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের অফিসার। জুনাইদ লাহোরের প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯০ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং এ গ্রাযুয়েশন করেন।

ছোট বেলা থেকে তার কণ্ঠ ছিল খুবই চমৎকার ও সুমিষ্ট। স্কুল, কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও কনসার্টে গান গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে তুলতেন। এভাবে তিনি ধীরে-ধীরে সুরের জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেন। ১৯৮৬ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে ভাইটাল সং ব্রান্ডদল গঠন করেন। ১৯৮৭ সালে পাকিস্তানের জাতীয় দিবস উপলক্ষে মুক্তি পায় তার একক এ্যালবাম *দিল দিল পাকিস্তান*। সর্বত্র বিপুল সাড়া পড়ল। আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা পেল তার এই এলবাম। সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল *দিল দিল পাকিস্তান*। ই.ই.ঈ ওয়ান্ড জরিপে জানা যায়, বিশ্বের ১৫০ টি দেশের সাতহাজার গায়কের সর্বকালের সেরা দশটি গানের তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছে দিল দিল পাকিস্তান। এরপর থেকে প্রফেশনাল গায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে জামশেদ পুত্রের ।

আকাশচুম্বি জনপ্রিয় এ গায়কের জীবনে অভাবনীয় এক পরিবর্তন আসে দাওয়াত তাবলীগের জীবন্ত কিংবদন্তী মাওলানা তারিক জামিলের অক্লান্ত মেহনত আর রোনাজারির বদৌলতে। লাখো মানুষ আল্লাহর রাস্তায় তিন চিল্লা সময় দিয়ে পাপ-পঙ্কিলতা ও গোমরাহীর ক্লেদাক্ত পথে ছেড়ে উঠে আসেন আলোর রাজপথে। একাকার হয়ে যান আলোক যাত্রীদের শুভ কাফেলায়। মিউজিক ক্যারিয়ার, গান, বাজনা ছেড়ে দিয়ে হয়ে যান দায়ী ইলাল্লাহ। দ্বীনের পথ প্রদর্শক। ইসলামের পয়গাম নিয়ে পথে প্রান্তরে, মাঠে ময়দানে, দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো এখন তার প্রধান কাজ। এর সাথে-সাথে চর্চা করেন ইসলামী সংগীত। তার দরাজ কণ্ঠের মোহনীয় সুরে গাওয়া ইসলামী সংগীতের টানে শ্রোতার অন্তরে জেগে উঠে ঈমানের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ।

বিশ্বের প্রখ্যাত ইসলামী স্কলার পাকিস্তানের সাবেক বিচারপতি মুফতী তাক্বি উসমানি ইসলামী সংগীত লিখেছেন এ স্টারের জন্য *ইলাহী তেরী চৌখাট পর ভিখেরী বনকে আয়াহুঁ*। তিনি এতো হৃদয়গ্রাহী ও মুগ্ধককর সুরে গেয়েছেন এ সংগীতটি যার প্রতিটি শব্দ অন্তরের গভীরে রেখাপাত করে। এর প্রতিটি কথা অবচেতন আত্মার মাঝে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এ ভাবেই সুরের যাদুকর জুনায়েদ জামশেদ এখন দ্বীনের রাহবর। জানা-অজানা আরো হাজারো দিক হারা পথের দিশা পাচ্ছে দাওয়াত তাবলীগের এ মেহনতের মাধ্যমে। পরিশেষে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত, হে প্রভু! আমাদের সবাইকে নিজের জিম্মাদারী মনে করে দাওয়াতের মেহনত ও তাবলীগের কাজ করার তাওফীক দান করুন।

সবচেয়ে ভাল মানুষ

আয়শা বিনতে ইসমাঈল

আল্লাহ তাআলার বিশিষ্ট নবী ও রাসূল হযরত মূসা আলাইহিস সালাম। বনী ইসরাঈলের সবচেয়ে বড় নবী। আসমানী চারখানা বড় কিতাবের অন্যতম তাওরাত শরীফ আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর নাযিল করেছিলেন। একদিন মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর উম্মত ও অনুসারীদের বললেন, তোমাদের মধ্যে সব চেয়ে ভাল মানুষটিকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তার অনুসারীরা দেশের এ প্রান্ত ও প্রান্ত খুঁজে একজন লোককে তার কাছে নিয়ে এলেন। ঐ লোক মূসা আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম করলেন। হযরত মূসা আ. সালামের উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করললেন, তুমিই কি সব চেয়ে ভাল মানুষ? লোকটি উত্তর দিল, আমি তো সেরূপ মনে করি না এবং এ সম্পর্কে জানিও না। তবে লোকে হয়তো আমার সম্পর্কে এমন ধারণা রাখে। তখন মূসা আলাইহিস সালাম তাকে বললেন, ঠিক আছে, তুমি এখন গিয়ে সব চেয়ে খারাপ মানুষটিকে খুঁজে নিয়ে এসো। লোকটি এখানে সেখানে খুঁজে খুঁজে অবশেষে একা একাই হযরত মূসা আ. এর কাছে ফিরে এলো। মূসা আ. তাকে একাকী ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দিয়েছিল? হে আাহর নবী! আমি অনেক খুঁজেছি, কিন্তু আমার চেয়ে খারাপ কাউকে পাইনি। আমার বিশ্বাস, আমিই সব চেয়ে খারাপ মানুষ। তাই আমি একাই ফিরে এসেছি। তখন হযরত মুসা আ. বললেন, তাহলে মানুষ যা বলে তাই সঠিক।

কী সুন্দর এই মৃত্যু

ইসহাক ওমর

প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে। এটা কোরআনের ঘোষণা। একদিন না একদিন সবাইকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। প্রত্যেক মানুষ চায়, তার জীবনের শেষ মুহূর্ত- মৃত্যুটা সৌভাগ্যের হোক। কিন্তু সেই সৌভাগ্যের মত্যু খুব কম মানুষের ভাগ্যে হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রাজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাভী রহ.। যার সারাটা জীবন ছিল ইসলামের জন্য নিবেদিত। উম্মাহর কল্যাণ ভাবনায় তিনি সর্বক্ষণ বিভোর থাকতেন। তাঁর আলোকিত জীবন ও সমুজ্জল মৃত্যুর মধ্যে আমাদের জন্য রেয়েছে অনেক শিক্ষার উপকরণ। তাঁর জীবনটা ছিল সুন্দর, ফুলের বাগানের মত সাজানো। তাঁর মৃত্যুর সময়টি ছিল আরো বেশি সুরভিত। এত সুন্দর মৃত্যু কে না কামনা করে? কল্পনা করতে পারেন, সময়টি ছিল বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে। ২২ ই রমজান। জুমাবার। প্রতি জুমার নিয়মানুযায়ী সুন্নত গোসল সেরে জুমার নামাজের আগে পবিত্র কোরআন নিয়ে বসলেন সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করার জন্য। কিন্তু অদৃশ্যের ইশারায় তিনি সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত শুরু করলেন। যে সুরাটির অপর নাম কুলুবুল কুরআন- কোরআনের হৃদয়। যা মুমিনের মৃত্যুকে সহজ করে। সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত শুরু করলেন। এক আয়াত দু' আয়াত করে তেলাওয়াত করতে করতে যখন 'ফাবাশ্শিরহুম বিমাগফিরাতিন ও আজরিন কারীম' -*তাকে সুসংবাদ দাও মাগফেরাতের আর মহান প্রতিদানের।* এ পর্যন্ত পৌছলেন, তখনিই মালাকুল মাউত এসে তাঁর রুহ বরণ করে নিলেন। তিনি প্রিয় প্রভুর ডাকে পরপারে পাড়ি জমালেন।

এমন মৃত্যুকেই তো বলা হয় সুন্দর মৃত্যু। প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে এমন মৃত্যুরই তো কামনা থাকে। মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে সুন্দর-সহজ ও সৌভাগ্যের মৃত্যু নসিব করুন।

লেখক : শিক্ষার্থী, হাটহাজারী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

আমীরের আনুগত্য

শিশিরধোয়া নির্মল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন রাসূল সহচর-সাহাবীগণ রা.। তাঁদের চরিত্র-মাধুর্যের কোন তুলনা হয় না। তাঁরা আমাদের আদর্শ, আমাদের অনুসরণীয়। নিম্নবর্ণিত একটি ঘটনা দ্বারা আমরা শিখব, সত্য ভাষণে তাঁরা ছিলেন অকুণ্ঠ। সত্যের প্রশ্নে রাজা-বাদশাকেও তারা তোয়াক্কা করতেন না। আর সত্যের আনুগত্যে তাঁদের আচরণ ছিলো অনুগত দাসের মত।

হযরত ওসমান রা. এর কোন আচরণে হযরত জায়েদ ইবনে ছওবান রা. অসন্তুষ্ট ছিলেন। একদিন হযরত জায়েদ ইবনে ছওবান রা. দাঁড়িয়ে প্রতিবাদী কণ্ঠে হযরত উসমান রা. কে বললেন, 'হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি সত্য পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন, তাই মুসলমানরাও সত্য ত্যাগ করছে। আপনি সঠিক পথে এসে দাঁড়ালে মুসলমানরাও সত্যের উপর মজবুত থাকবে।'

হযরত ওসমান রা. তাঁর বক্তব্যকে অবাস্তব মনে করে এর উত্তর দেয়া থেকে বিরত রইলেন। তবে তিনি অত্যন্ত শান্তভাবে তাঁকে বললেন, 'তুমি আমার কথা শুনবে? আমার আনুগত্য করবে?

জায়েদ ইবনে ছওবান রা. বললেন, নিঃসন্দেহে।

হযরত ওসমান রা. বললেন, তবে তুমি সিরিয়া চলে যাও।

জায়েদ তখনই মজলিস থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং সিরিয়ার পথে রওনা হয়ে গেলেন।

কেননা মতের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও জায়েদ রা. বিশ্বাস করতেন, আমীরের অনুসরণ ও আনুগত্য করা ওয়াজিব।

আবু মাহমুদ

বুলবুল সরওয়ার
যে হা রা য় পূ র্ণি মা য়

রাতের আঁধারে
যৌবনের উন্মীলনে
শরীরের সহজ জীববিজ্ঞানে
তুমি যখনই এসেছো
নিবিড় সান্নিধ্যে-
গণক প্রহর থেমে গেছে;
নদীর স্রোতের মত
আনন্দের উৎপল ফুটেছে
আকাশের নীলে;
ৰরাতের স্নিগ্ধতায়
অলৌকিক কিন্নরী ঘেরা
আমাদের শয্যা
খুয়াইলিদ ও আবুবকরের কন্যাদের মত
সান্নিধ্যের অধিকার পেয়ে
হেসে উঠেছে;
আহা যদি সে-সময়
ইউরোপ ও আমেরিকার কবিরা
মিলিত হতো
আফ্রো-এশিয়ার কবিদের সাথে,
তাহলে নিশ্চয়ই
পাবলো নেরুদা হাজির হতেন
গালিবের জানাজায়
ভালবাসায় উৎকীর্ণ আকাশ কেঁদে উঠতো :
প্রভু-প্রভু! চোখ কখনো অন্ধ হয় না
বরং সেই হৃদয়
যাকে বুকের নীচে গোপন রেখেছো
স্বেচ্ছাচারে অন্ধ হয়েছিল!

সুলাইমান সাদী
আমার যুদ্ধের নাম ভালোবাসা

আমি শান্তির আপোসে করি মুক্তির সংগ্রাম
ঠাণ্ডা পানি ঢেলে ভাঙি অবরোধ বিদ্রোহীর আস্ফালন
আমার সেনারা ঢাল চেনে, চেনে না বন্দুক, শত্রুর বুলেট
ফিরে ছুটে যায় বল হয়ে আনন্দের জন্য।

আমি ভালোবাসতে শিখেছি।
কবেই পুড়িয়ে ফেলেছি অশুদ্ধ বানানে লিখিত শত্রুতার অভিধান
আমার দেহের কোষে কোষে লুকিয়েছি তোমার স্রোস্তস্মারক
তোমার সেনারা এসে অপরিচিত মুখে পাঠ করে চলে যায়-

আমার কপতী-সরকারে আছে
মনমন্ত্রী দেহমন্ত্রী বোধমন্ত্রী যুদ্ধমন্ত্রী
আমার যুদ্ধের নাম আগেই বলেছি।

পৃথিবীতে শান্তিরক্ষা কমিটি হয়েছে
ভালোবাসারক্ষা কমিটি হয়নি কেন?

উত্তরে বলতে পার, সে তো বাস করে ওপিঠে শান্তির

আমি বলব, এগুলো তোমাদের বিদ্বেষী বাক্য
এসবের বিরুদ্ধে আমার ভালবাসার যুদ্ধ।

সংবাদ

খেলাফত আন্দোলন প্রধান আমীরে শরিয়াত শাহ আহমাদুল্লাহ আশরাফ-এর বিবৃতি

জালেম সরকারের জুলুম থেকে মুক্তির জন্য নফল রোজা খতমে ইউনুস ও বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

সরকার ইলেকশনের নামে মহাপ্রহসন করেছে ভোট কেন্দ্র বয়কট করে জনগণ সরকারকে না বলে দিয়েছে

০৫, ০১, ২০১৪ বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন প্রধান আমীরে শরীয়ত ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর মাওলানা শাহ আহমাদুল্লাহ আশরাফ ৫ই জানুয়ারি রবিবার খেলাফত আন্দোলন ঘোষিত দেশ ব্যাপী নফল রোজা পালন, খতমে ইউনুস ও দোয়া মাহফিলের অংশ হিসেবে বাদ আসর কামরাঙ্গির চর জামিয়া নুরিয়া ময়দানে অনুষ্ঠিত খতমে ইউনুস শেষে দোয়াপুর্বক ভাষণে বলেছেন, আল্লাহ-ই হচ্ছেন সকল ক্ষমতার উৎস, তার রহম করম, মদদ ছাড়া আমাদের কোন গতি নেই। এবং জালেম সরকারের জুলুমের প্রতিবাদ ও তার প্রতিরোধে দোয়াই আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আমাদের ফরিয়াদ, হে আল্লাহ! এ জালেম সরকারের হাত থেকে দেশবাসী কে রক্ষ করুন।

তিনি আরো বলেন, ৫ ই জানুয়ারির কথিত নির্বাচন ভোটার বিহীন ভুয়া ভোট। ব্যার্থ সরকার একাধারে আল্লাহর হক ও আল্লাহর বান্দা জনগণের হক নষ্টের মতলবে ইলেকশনের নামে এক মহাপ্রহসন মঞ্চস্ত করেছে, কিন্তু সচেতন জনগন মতলব বুঝে ভোট কেন্দ্র বয়কট করে সরকারকে না বলে দিয়েছে। তাই এই সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই। এই সরকার অবৈধ সরকার।

উক্ত খতমে ইউনুস ও দোয়া মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের মহাসচিব মাওলানা মুহাম্মাদ জাফরুল্লাহ খান, যুগ্ন মহাসচিব মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজী, সহকারি মহাসচিব মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী, কেন্দ্রীয় নেতা আলহাজ্ব মুহাম্মাদ আজম খান, মুফতি ফখরুল ইসলাম, মাওলানা সাইফুল ইসলাম ও মাওলানা সুলতান মহিউদ্দিন প্রমুখ।

মাওলানা জাফরুল্লাহ খান বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই আল্লাহর খেয়ে পড়ে, আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করে সংবিধান থেকে আল্লাহর নাম মুছে দিয়েছে। এর চাইতে বড় জালেম আর কে হতে পারে। আল্লাহর বান্দা জনগণের উপর খুন, গুম, গ্রেফতার সহ জুলুম নির্যাতনের যে স্ট্রীম রোলার চালিয়ে যাচ্ছে তা মোকাবেলা করার অস্ত্র আমাদের নেই। তবে মোমিনের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে আল্লাহর নিকট দোয়া, ফরিয়াদ করা

তিনি আরো বলেন, সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ ছিল দিনে বাতেলের মোকাবেলায় জেহাদ করা আর রাতের অন্ধকারে আল্লাহর এবাদতে মগ্নহয়ে দেশ ও জাতির মুক্তির জন্যে মুনাজাত করা। আমাদেরকে সেই আদর্শের যুগপত কর্মসুচি জেহাদ ও ইবাদত চালিয়ে যেতে হবে।

খেলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তাদের ভাষণে বলেন, চলমান আন্দোলনে সরকার ও তাদের দোসরদের হাতে যারা নিহত হয়েছে তারা শহীদ। সরকার জবরদস্তী করে নির্বাচনের নামে প্রহসন করে গণতন্ত্রের নামে গরুতন্ত্র চালু করেছে। তারা আরো বলেন, সরকারের এই জালিয়াতি প্রবণতার কারণেই বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল আওয়ামিলীগের অধীনে নির্বাচন বয়কট করে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তত্বাবধায়ক সরকারের দাবী করে আসছিল। তাই অনুষ্ঠিত গোলযোগ পুর্ণ প্রহসনের নির্বাচন প্রমাণ করে, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন নয় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তত্বাবধায়ক সরকারের কোন বিকল্প নেই। তাই ভোটাধীকারের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে এই সরকারের পতনের জন্য আন্দোলনকে আরো বেগবান করতে হবে।

যশোর ও ঠাকুরগাঁওয়ে সংখ্যালঘুদের উপর হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ

সংখালঘুদের উপর হামলা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র

০৯, ০১, ২০১৪ বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন প্রধান আমীরে শরীয়ত ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর মাওলানা শাহ আহমাদুল্লাহ আশরাফ যশোরের অভয়নগর ও ঠাকুরগাঁওয়ে নিরিহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাদেরকে শারিরীক মানসিক নির্যাতন ও বাড়ী-ঘর, আসবাব প্রত্র ভাংচুর করার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, মতলববাজ মহল মুলতঃ ইসলাম ও মুসলমানদের উপর দোষ চাপানোর জন্যই পরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর এই বর্বরচিত হামলা চালিয়েছে। এ ধরনের দাঙ্গাবাজী তৎপরতা ইসলামী আদর্শ পরিপন্থি। ফেতনা ফাসাদ কেবল শয়তানের অনুচরদের দারাই সম্ভব। যেমনি ভাবে ৫ই মে রাজধানী ঢাকার জাতীয় মসজিদে কোরআন কিতাবে আগুন লাগিয়ে ভস্মিভুত করা হয়েছিল। একই গোষ্ঠী পরিকল্পিত ভাবেই অভনগর ও ঠাকুরগাঁওয়ে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা চালিয়েছে।

মাওলানা আশরাফ বলেন, বাংলাদেশে যারা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবক্তা তারাই মূলত সব সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি বিনষ্ট করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করে ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকতে অপপ্রয়াশ চালাচ্ছে। হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমীর আল্লামা শাহ আহমাদ শফী ঘোষিত ১৩ দফার মধ্যে ১টি দফা হচ্ছে সংখ্যালঘুদের সব ধরনের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু সরকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধান না করে রাজনৈতিক মতলব হাসিলে অরাজকতার সুযোগ নিয়ে দেশের জনগণ ও আন্তর্যাতিক মহলের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাতে চাচ্ছে। তারা সর্প হয়ে দংশন করে আবার ওঁঝা হয়ে ঝাড়ে। এই নীতিতে হামলাকারীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। অপরদিকে ঘটনার পর দেশে জঙ্গিবাদ মৌলবাদে ছেয়েগেছে বলে চিৎকার করে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের নীলনকশা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে এই পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের উপর যত হামলা নির্যাতন করা হয়েছে তার কোনটার সাথেই এদেশের আলেম সমাজ, ইসলাম প্রিয় জনতা ও সংগঠনের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশের জনগণ এই মতলববাজী রাজনীতির চালবাজী বুঝেগেছে। তাই তারা ৫ই জানুয়ারির প্রহসনের নির্বাচন বর্জন করেছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর জামিয়া নুরিয়া মাদরাসায় বাংলাদেশ খেলাফত স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলনের উদ্যোগে আয়োজিত 'আত্মশুদ্ধির অঙ্গনে ওলামায়ে দেওবন্দের অবদান' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন। খেলাফত স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলনের আহবায়ক মাওলানা হাবিবুলাহ মিয়াজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান আলোচক ছিলেন বারিধারা মাদরাসার শায়খুল হাদিস মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ফারুক, শায়খুল হাদিস মাওলানা সোলায়মান নোমানী, শায়খুল হাদিস মাওলানা হাজী ফারুক আহমাদ, মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী, মুফতি ফখরুল ইসলাম, মাওলানা সুলতান মহিউদ্দিন, ,মাওলানা সাইফুল ইসলাম ও মাওলানা ইলিয়াস মাদারিপুরী প্রমুখ।

মাওলানা আশরাফ আরো বলেন, শান্তিপ্রিয় সংখ্যালঘুদের ধর্ম-কর্ম ও জান-মাল ইজ্জতের হেফাজত করা মুসলমানদের ঈমান-আমলের গুরু দায়িত্ব। তাই খেলাফত-হেফাজতের নেতা-কর্মী তথা দেশের ওলামা ও দীনদ্বার সমাজকে সোচ্চার হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী নাস্তিকি চক্রান্তকে বাঞ্চাল করে দিতে হবে।

দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের বিকল্প নেই

১১, ০১, ২০১৪ বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন প্রধান আমীরে শরীয়ত ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর মাওলানা শাহ আহমাদুল্লাহ আশরাফ এক বিবৃতিতে বলেছেন, বর্তমান ক্ষমতা লোভী সরকার ক্ষমতা ধরে রাখতে নিজের খায়েস পুরনের জন্য সকল পরামর্শকে উপেক্ষা করে মনগড়া নির্বাচন দিয়ে দেশকে আরো গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। দেশে এখন চরম অচলাবস্থা বিরাজ করছে। তিনি চলমান এ চরম সংকট নিরসনে অবিলম্বে ১০ম সংসদ নির্বাচন বাতিল করে সংবিধান সংশোধন করতঃ সকল দলের অংশ গ্রহণে অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, অন্যথায় দেশে আরো ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের বিকল্প নেই।

তিনি বলেন, আপনারা এমন নির্বাচন করে সরকার গঠন করছেন যে সহিংস ও একতরফা নির্বাচনে পুলিশের গুলিতে ২২ জনের অধিক লোক মারা গিয়েছে। জনগণ ভোট কেন্দ্রে না গিয়ে সরকারের প্রতি অনাস্থা জানিয়েছেন। মহাজোটের নেতা কর্মিরা জাল ভোট দিয়ে ব্যালট বাক্স পূর্ণ করেছে বলে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচার হয়েছে। তার পরও যারা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন হয়েছে বলে দাবী করেন, তাদের মুখে শান্তির কথা মানায় না।

তিনি বলেন, বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোট কারচুপি ও জালিয়াতির কারণে আওয়ামীপন্থী অনেক প্রার্থিকে নির্বাচন বয়কট করতে দেখাগেছে। সারাদিন ভোট কেন্দ্রগুলো ভোটার শুন্য ও ফাঁকা থাকার পরেও নির্বাচন কমিশন রাতের আধারে ৪২ ভাগ ভোট কোথার সাথে জনগণের হিসেবে মিলছে না। এই প্রহসনের নির্বাচনের সরকার জাতির কাছে বৈধ সরকার হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পাবেনা।

ইনকিলাব অফিসে তল্লাশি ও ছাপাখানা বন্ধ করে দেয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর নগ্ন হস্তক্ষেপের শামিল

১৭, ০১, ২০১৪ বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আমীরে শরিয়ত মাওলানা শাহ আহমাদুল্লাহ আশরাফ এক বিবৃতিতে দেশের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় পত্রিকা দৈনিক ইনকিলাব অফিসে তল্লাসি, ছাপাখানা সিলগালা ও তিন সাংবাদিককে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, এটা সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত, অনাকঙ্ক্ষিত এবং সংবাদপত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর নগ্ন হস্তক্ষেপের শামিল। তিনি বলেন, দৈনিক ইনকিলাব দেশ ও জাতির প্রাণপ্রিয় মুখপাত্র এবং ইসলামী শক্তির বলিষ্ঠ কণ্ঠ। ইনকিলাব এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও ইসলামী জাগরণের প্রতীক। ইনকিলাব এদেশের কোটি কোটি দেশপ্রেমিক তৌহিদী জনতার প্রাণের স্পন্দন। দৈনিক ইনকিলাব যখন দেশ, ইসলাম ও মানবতার পক্ষে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে দুর্নীতিবাজ, আধিপত্যবাদ, ফ্যাসিবাদ ও নাস্তিক্যবাদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন তখনই সরকারের ব্যর্থতা ঢাকতে সময়ের সাহসী দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকাকে বন্ধ করে দিয়েছে। সরকার সংবাদপত্র ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া বন্ধ করার এ ষড়যন্ত্র বন্ধ না করলে জনগণ তার সমুচিত জবাব দিবে।

মাওলানা আশরাফ আরো বলেন, বর্তমান সরকার তাদের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে ভিন্নমত দমনে যে ফ্যাসিস্ট তৎপরতা শুরু করেছে জাতীয় পত্রিকা ও মিডিয়া বন্ধের এ ঘটনা তারই ধারাবাহিকতা। আওয়ামিলীগের অতীত শাষনামলেও দেখা গেছে, মাত্র ৪টি পত্রিকা রেখে বাকি সকল পত্রিকা বন্ধকরে দেয়া হয়েছিল। এটা সরকারের বাকশালী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর আলেম-উলামা, ইসলামী জনতা ও বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নের পাশাপাশী সংবাদপত্র ও মিডিয়ার কণ্ঠরোধ করে চলেছে। তাদের চরিত্র হলো, তারা ভিন্নমত সহ্য করতে পারে না। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়ে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকার যে স্বপ্ন দেখছে সেই স্বপ্ন জনতার অভ্যুত্থানে চুরমার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ।

বিবৃতিতে মাওলানা আশরাফ দৈনিক ইনকিলাব ও আমার দেশ চালু এবং দিগন্ত ও ইসলামিক টিভি খুলে দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

==============================

রাজধানীর বাস্তুহীন মানুষের মধ্যে খেলাফত আন্দোলনের কম্বল বিতরণ

শীতে মানুষ মৃত্যুবরণ করছে আর সরকার ক্ষমতায় থাকতে বিরোধী দল দমন এবং ইসলাম নির্মূলে ব্যস্ত ররেছে

- মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সহকারী মহাসচিব ও ঢাকা মহানগরীর আমীর মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী বলেছেন, প্রচণ্ড শীতের প্রকোপে অসহায়, দুস্থ ও ভাসমান মানুষের জীবন আজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। শীতের তীব্রতা বৃদ্ধির কারণে শীতবস্ত্রের অভাবে শ্বাসকষ্ট ও নিউমোনিয়াসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। শীতার্তদের কষ্ট লাঘবে তাদের সাহায্যে সমাজের বিত্তশালীদের এগিয়ে আসা মানবিক ও সমাজিক দায়িত্ব। অসহায় দুস্থ মানুষের সীমাহীন কষ্ট, দুভোর্গ লাঘবে ব্যবস্থা করা সরকারের প্রধান কর্তব্য। শীতে একটি মানুষের মৃত্যু হলেও সরকারকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

মাওলানা হামিদী বলেন, শীতে যখন দরিদ্র মানুষ মৃত্যুবরণ ও কষ্ট করছে, তখন বর্তমান সরকার আজীবন ক্ষমতায় থাকতে বিরোধী দল দমন এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে এ দেশকে রামরাজ্য বানাতে ব্যস্ত রয়েছে। খোলা আকাশের নিচে জীবন-যাপনকারী অসহায় মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে সরকার কোন প্রদক্ষেপই নিচ্ছে না। সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, ব্যর্থতা ও জুলুম-নির্যাতনের কারণে জনমনে ক্ষোভের আগুন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের স্বার্থে অবিলম্বে সরকার পদত্যাগ না করলে দেশ গভীর সংকটে পরবে।

শুক্রবার সকাল ৮ ঘটিকায় বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে আজিমপুর পলাশীর মোড় ও শহীদনগর এলাকায় ঘরহীন শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ কালে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দলের যুগ্ম মহাসচিব ও ঢাকা মহানগর উপদেষ্টা মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজী, কেন্দ্রীয় নেতা আলহাজ মুহাম্মদ আজম খান, মহানগর সেক্রেটারী মাওলানা হাফেজ আবু তাহের, সহকারী সেক্রেটারী মুফতী আব্দুর রহিম কাসেমী, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মাহবুবুর রহমান ও অর্থ সম্পাদক শাহজাহান মিয়া প্রমুখ।

সরকার তার অপকর্ম ঢাকতেই দৈনিক ইনকিলাব বন্ধ করেছে

- মুফতি ফখরুল ইসলাম

১৭. ০১. ২০১৪ বাংলাদেশ খেলাফত যুব আন্দোলনের সভাপতি মুফতি ফখরুল ইসলাম এক বিবৃতিতে দৈনিক ইনকিলাব অফিসে পুলিশি তল্লাশি, সাংবাদিক গ্রেফতার ও ছাপাখানা সিলগালা করে দেয়ার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, দৈনিক ইনকিলাব এই দেশের ইসলাম মুসলমান ও দেশ প্রেমিক জনতার পক্ষে অবস্থান নিয়ে নাস্তিক ও দেশদ্রোহীদের মুখোশ উম্মোচন করার কারণেই বাকশাল সরকার আজ ইনকেলাব বন্ধ করার চেষ্টা করছে। সরকার

জানে না, দৈনিক ইনকিলাব এই দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। ইনকিলাব সম্পাদক আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দিন মজলুমের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠ। তিনি দৈনিক ইনকিলাবের মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদ, দেশদ্রোহী, দুর্নীতিবাজ, আদিপত্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের মুখোশ উন্মোচন করছেন।

মুফতি ফখরুল ইসলাম বলেন, সরকার দেশের নিরিহ জনগন, আলেম ওলামা, পীর মাশায়েখ, বিরোধী দল ও ইসলামী দল সমুহের নেতা কর্মিদের উপর জুলুম নির্যাতন, হত্যা, গুম এবং নিজেদের ব্যর্থতা ও অপকর্ম ঢাকতেই সত্য প্রকাশকারি সময়ের সাহসি পত্রিকা ইনকিলাব বন্ধ করার গভীর ষড়যন্ত্র করছে। বর্তমান সরকার দেশকে জুলুমের রাজ্যে পরিণত করেছে। আজ দেশের জনগনের নাগরিক, গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার নেই। সত্য কথা লিখলে ও বললে গ্রেফতার, নির্যাতন ও হয়রানী করা হয়। ইসলাম, ঈমান ও দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন।

মুফতি ফখরুল ইসলাম আরো বলেন, সরকার যদি ইসলামী জনতার মুখপত্র ও সময়ের সাহসি পত্রিকা দৈনিক ইনকিলাবের বিরুদ্ধে সবধরনের ষড়যন্ত্র বন্ধ না করে ও গ্রেফতারকৃত সাংবাদিকদের নিঃশর্ত মুক্তি না দেয় এবং ইনকিলাবের ছাপাখানা খুলে না দেয় তাহলে দেশের জনগণ ও ইসলামি জনতা সরকার পতনের আন্দোলনে মাঠে নামতে বাধ্য হবে।

ইসলামী বিশ্ব

পাক-ভারত সম্পর্কের অবনতি : কে বেশী দায়ী

কুলদীপ নায়ার

পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ বারবার আলোচনা চালু করার জন্য বলছেন, যা ২০০৮ সালের নভেম্বরে মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী হামলার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। তার ভাই পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ কিছুদিন পূর্বে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশে সফরকালে এমনই আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেছেন তিনি উভয় দেশকে আলোচনার ধারা শুরু করার পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে উভয় দেশ নিজেদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারে। কেননা লড়াই কোন সমাধান আনতে পারে না।

ভারতের পররাষ্ট্র বিষয়কমন্ত্রী সালমান খুরশিদও বলেছেন যে, তিনি আলোচনার বিপক্ষে নন। কিন্তু এর সাথে তিনি শর্তও জুড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আলোচনা বাস্তবায়নের জন্য অনুকূল পরিবেশ থাকতে হবে। সম্ভবত তার মাথায় সে সকল বিরোধপূর্ণ বিষয়াবলী রয়েছে, যার দ্বারা দুটি দেশের মাঝে সম্পর্কের মাঝে তিক্ততা তৈরী হয়েছে।

একটি বাধা হচ্ছে মুম্বাই হামলা। অপরাধীদের সাজা না দেওয়ার যে পদক্ষেপ পাকিস্তান নিয়েছে তাতে এটা স্পষ্ট যে, তারা শুধু একটা অনুশীলন চালু রেখেছে। পাঁচ বছর পরও আদালতে মামলাটি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। মামলার শুনানি পরিচালনাকারী কয়েকজন বিচারক হয়তো বদলি হয়েছেন, নয়তো তাদের ছুটিতে যেতে বলা হয়েছে। হায় যদি পাকিস্তানের প্রধান বিচারক মুহাম্মদ ইফতেখার চৌধুরী যিনি কথায়-কাজে স্বীয় দেশের সংবিধানকে সমুন্নত রেখেছেন- কিছুদিন পূর্বে অবসরগ্রহণের পূর্বে এ বিষয়টিকে নিজে থেকে নিষ্পত্তি করে দিতেন! হয়তো বা এ প্রস্তাবে বহু উকিল হাসাহাসি করবেন, কিন্তু উভয়দেশের মাঝে সম্পর্ককে দৃঢ় করার প্রথম শর্ত হচ্ছে ২৬ নভেম্বরের সন্ত্রাসীদের সাজা দেওয়া।

এমন নেতিবাচক পরিস্থিতি সত্ত্বেও ভারতের সাধারণ মানুষ পাকিস্তানের প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত পর্যটকরা পাকিস্তানের জনগণের ভালোবাসা ও আপন করে নেওয়ার কথা উল্লেখ করতে মোটেও কার্পণ্য করেন না। ঠিক একই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন ভারত থেকে প্রত্যাগত পাকিস্তানের পর্যটকরা। এ কারণে সকল অভিযোগ রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে হওয়া উচিত, যারা চান না মতবিরোধ নিঃশেষ হয়ে যাক। সম্ভবত দুটি দেশকে একে অপর থেকে দূরে রাখাতে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ নিহিত রয়েছে। একজন পাকিস্তানি সরকারি কর্মকর্তা সংবাদ মাধ্যমকে কিছুদিন পূর্বে জানিয়েছেন যে, নওয়াজ শরীফ সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, কাশ্মির পাক-ভারতের মাঝে চতুর্থ যুদ্ধ বেধে যাওয়ার কারণ হতে পারে। এ সংবাদ প্রচার হওয়ামাত্র নওয়াজ শরীফের দফতর তাৎক্ষণিক প্রতিবাদমূলক বিবৃতি প্রকাশ করে। কিন্তু ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার, তা হয়ে গেছে। মনমোহন সিং - যিনি একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ- দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ করে বসলেন। তিনি বললেন, পাকিস্তান কখনোই ভারতের সাথে লড়াইয়ে জিততে পারবে না। আমার সন্দেহ, তার এই প্রতিবাদ আগামী পার্লামেন্ট নির্বাচনকে সামনে নিয়ে 'শক্তি'র আত্মপ্রকাশমাত্র।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বা তিনি যে দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই কংগ্রেসের এই অনুভূতিটুকু নেই যে, বর্তমানে বিজেপি পর্যন্ত পাকিস্তান বিরোধী প্রোপাগান্ডা পরিত্যাগ করেছে। কেননা পাকিস্তান বিরোধিতায় জনগণের মনোযোগ ও আগ্রহ কমে যায়। হতে পারে দলের ভেতর বা বাইরে কিছু লোক ইতিহাসের বোঝা বিশেষত ১৯৪৭ সালের ভারতভাগের কষ্টের বোঝা বইয়ে যাচ্ছেন, তথাপি পাকিস্তান বিরোধী চিন্তাভাবনা ও মানসিকতা গ্রহণ করার লোক এখন আর নেই।

পাকিস্তানে একটা ভুল প্রোপাগান্ডা চালানোর প্রচেষ্টা করা হচ্ছে যে, ভারতের মিডিয়া পাকিস্তানের দুর্নাম করতে ওত পেতে থাকে। এ কথা ঠিক নয়। আমার ইচ্ছা, পাকিস্তান সম্পর্কে ভারতের মিডিয়ায় আরও খবর প্রচার হোক। কিন্তু একারণে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য উভয়দেশের সরকারিই দায়ী। উভয় দেশ সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ে এক হতে পারে। নওয়াজ শরীফ একটা বিশেষ প্রস্তাব দিয়েছেন, উভয় দেশ সন্ত্রাস বিষয়ে আলোচনার জন্য নিজেদের নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারে। অবশেষে দুটি দেশ জম্মু-কাশ্মির সীমান্তে নিয়ন্ত্রণরেখার পরিচ্ছন্নতাকে নিশ্চিত করার জন্য নিজ নিজ মিলিটারি অপারেশনের ডাইরেক্টর জেনারেলের বৈঠক নির্ধারণ করেছে। এ পরিবর্তন ইতিবাচক।

এরপরও এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, দুটি দেশকে একে অপরের প্রতি কীভাবে আস্থাশীল করা যায়, তা নিয়ে ভাবা। নওয়াজ শরীফ যথার্থই বলেছেন যে, দুটি দেশের মাঝে দূরত্বের মূল কারণ 'আস্থার অবনতি'। পাকিস্তানের বহুলোকের ধারণা, মূল সমস্যা কাশ্মির। এটা রোগের লক্ষণ বটে, তবে রোগ নয়। যদি পারস্পরিক আস্থা না থাকে তাহলে কাশ্মির সমস্যার সমাধান হয়ে গেলেও আবার নতুন কোনো সমস্যা মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠবে।

দুটি দেশ তাদের পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় আছে। এ জন্য তাদের নিজস্ব সমস্যাবলী শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করতে হবে। এ পলিসি প্রথমবার ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর তাসখন্দে গ্রহণ করা হয়েছিল। তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী সমস্যা সমাধানের জন্য শান্তিপ্রিয় পন্থা অবলম্বনের উপর জোর দিয়েছিলেন। সে সময় পাকিস্তানের মার্শাল ল' শাসক জেনারেল মুহাম্মদ আইউব খান জাতিসঙ্ঘের অঙ্গীকারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন, এ শর্ত পূরণ করা হবে। যৌথ মুসাবিদার বক্তব্যে এ শব্দগুলোই ছিল। শাস্ত্রী আইউবকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন- 'অস্ত্রনির্ভর ব্যতীত'।

ইসলামাবাদ বলছে, এলওসি (লাইন অব কন্ট্রোল) মেনে চলার দায়িত্ব উভয় দেশের। নতুন দিল্লি বলেছে, এলওসি সামরিক বিষয়। এটা কোন রাজনৈতিক সমস্যা নয়। যদি এমনই মনোভাব পাকিস্তানের হতো - যেখানে সেনা আধিপত্য বেশী- তাহলে এটা মেনে নেয়া যেতো, কিন্তু গণতান্ত্রিক ভারত এটা কেমন করে বলতে পারে যে, এর মীমাংসা উভয়পক্ষের সেনারা করবে?

এলওসি চুক্তি শিমলাতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর বৈঠকের সময় সম্পাদিত হয়েছে। সেনা কমান্ডাররা মাটির বুকে শুধু সেই রেখা টেনে দিয়েছেন, যা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ চিহ্নিত করে দিয়েছেন। নতুন দিল্লির এ ব্যাপারে আবারও চিন্তা করা উচিত, যাতে দুটি দেশ দৃঢ় সম্পর্কের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। সময়ের চাহিদা এটাই।

* কুলদীপ নায়ার : ভারতের প্রবীণ সাংবাদিক

দিল্লি থেকে প্রকাশিত দৈনিক রাষ্ট্রীয় সাহারা
২৫ ডিসেম্বর, ২০১৩ হতে
উর্দু থেকে ভাষান্তর ইমতিয়াজ বিন মাহতাব
ahmadimtiajdr@gmail.com

ইসলামিয়া কুতুবখানা কর্তৃক প্রকাশিত

নির্ভরযোগ্য অভিধানসমূহ
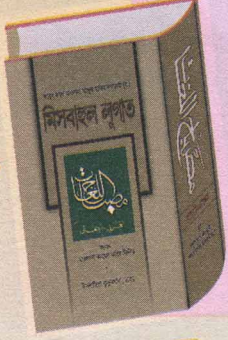
- অভিধানটির শব্দবিন্যাস مادة হিসেবে করা হয়েছে।
- সংকলকের অনুবাদভঙ্গিকে অক্ষুণ্ন রেখে অনুবাদের ক্ষেত্রে مصدری অর্থ করা হয়েছে।
- প্রতিটি শব্দের একাধিক বাংলা প্রতিশব্দ দেখানো হয়েছে।
- অভিধানে উল্লিখিত কুরআন হাদীসের প্রতিটি উদ্ধৃতি, আরবি প্রবাদ, বাগধারা ইত্যাদির সরল অনুবাদ দেওয়া হয়েছে।
- মূল অভিধানে বিদ্যমান حركة-এর ত্রুটিসমূহ যথাসাধ্য সংশোধন করা হয়েছে।
- পাঠকবৃন্দের সুবিধার্থে মূল শব্দকে ভিন্ন ফন্টে উল্লেখ করা হয়েছে।
- মূল অভিধানের পরিশিষ্টে সংযোজিত প্রায় দু'হাজার আধুনিক শব্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

- সমার্থক শব্দ প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ হিসেবে বিন্যস্ত হয়েছে।
- মূলশব্দ মোটা অক্ষরে উল্লেখের পাশাপাশি একাধিক সমার্থক শব্দ দেখানো হয়েছে।
- বিভিন্ন আকৃতিতে একাধিক শব্দ আনয়নের পর তার প্রয়োগ দেখানো হয়েছে।
- অধিকাংশ শব্দ মাসদার আবার কখনো ফেল দ্বারা শুরু করা হয়েছে।
- একই শব্দ বিভিন্ন অক্ষরের অধীনে নানাভাবে ব্যবহার এবং রূপ ধারণের কারণে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

- এতে রয়েছে দৈনন্দিন ব্যবহৃত শব্দাবলির ব্যাপক সমাহার।
- কুরআন-হাদীস ও পাঠ্য কিতাবাদিতে ব্যবহৃত অসংখ্য শব্দাবলি।
- প্রায় বিশ হাজার শব্দের সমাহার।
- পাক ভারত উপমহাদেশের বাংলাভাষী ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য খুবই জরুরি।
- দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের পছন্দনীয় ও গ্রহণযোগ্য।
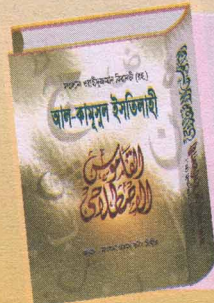
- অভিধানটি আধুনিক লিটারেচার বুঝার জন্য সংকলিত।
- এতে অত্যধিক নতুন পরিভাষা স্থান পেয়েছে।
- অভিধানটি বর্ণানুক্রম অনুসারে বিন্যস্ত।
- প্রায় বিশ হাজার শব্দ ও পরিভাষা সন্নিবেশিত।
- ভুক্তিগুলোর অনুবাদ করা হয়েছে প্রায়োগিক ও পারিভাষিক প্রতিশব্দে।
- অভিধানটি শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের ভূয়সী প্রশংসাপ্রাপ্ত।

- আধুনিক বাংলা বানান অনুসরণ।
- প্রচলিত ইংরেজি শব্দ সংযোজন।
- প্রচলিত আরবি ও ফারসি শব্দ সংযোজন।
- যথার্থ অর্থবোধ ও সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য পদ সংকেত উল্লেখ।